সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপে সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে ফ্রান্স জিতে নিয়েছে ট্রফি। সেই ফ্রান্স দেশটাতেই নাকি জন্ম হয়েছিল 'কয়েন' শব্দটার। মধ্যযুগে শব্দটা ইংরেজি ভাষায় ঢুকে পড়েছিল ফ্রেঞ্চ 'কয়েন' লাতিন শব্দ 'কিউনিয়াস' থেকে। এখন যেমন 'কয়েন' বলতে মুদ্রা বুঝি, সেকালে 'কয়েন' মানে ছিল মুদ্রা ছাপানোর ছাপ। ধাতুকে ছাঁচে ফেলে বানিয়ে দিত 'কয়েন', পরে সেটি নিজেই হয়ে গেল মুদ্রা বোঝানোর অর্থ। শব্দের পেছনে ছুটতে গেলে এরকম কত মজার তথ্য যে জানা যায়! এই সংখ্যা ছুটেছে 'কয়েন'-এর সন্ধানে। তোমরাই বলো, কতটা মজার হতে পেরেছে এবারের নবারুণ। বলবে কিন্তু!

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

নিবন্ধ

৪ মুদ্রাহীন বিনিময় ব্যবস্থা/ মিনহাজ উদ্দীন আহাম্মদ
৫ টাকাপয়সার কথা/ সালেহা চৌধুরী
৮ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ/ আব্বাস উদ্দিন আহমেদ
১০ শখের মুদ্রা/ মোস্তাফিজুর রহমান নাঈম
১২ বাংলাদেশের মুদ্রার ইতিহাস/ খাইরুল ইসলাম (তাজ)
১৪ কয়েনে লেখা ইতিহাস/ আব্দুল্লাহ মারজুক
১৫ টাকার জাদুঘর/ শাহানা আফরোজ
১৬ মুদ্রার জয়যাত্রা/ হাফিজ উদ্দীন আহমদ
২০ বাংলাদেশে কয়েনের ব্যবহার/ শামসুজ্জামান শামস
২২ মুদ্রাতত্ত্ব, মুদ্রাতথ্য/ চান্দ্রেয়ী পাল মম
২৪ স্মৃতিতে-প্রীতিতে কয়েন/ মোমিন মেহেদী
৩৮ স্কুল ব্যাংকিং/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৪ বুদ্ধির খেলা/ আনোয়ারা বেগম
৫৮ দৃষ্টি জয়ীরাও পড়তে ভালোবাসে/ নাজিয়া জাবীন
৫৯ টি-টোয়েন্টিতে নারীদের এশিয়া জয়/ জান্নাতে রোজী
৬০ ফল প্রদর্শনী/ মো. জামাল উদ্দিন
৬১ তথ্য অধিকার আইন/ মেজবাউল হক
৬২ অজানাকে জানো/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সায়েন্স ফিকশন

১৮ পার্থিব স্মারক কয়েন/ সৌর শাইন
২৭ আশ্চর্য কয়েন/ কমলেশ রায়

গল্প

৩৭ জাদুর কয়েন/ মোছা. আবিদা সুলতানা
৪০ নীতুর বন্ধু ডলফিন/ তাহমিনা রহমান নিশাত
৪৩ কাঠুরিয়ার গান/ নূর সিদ্দিকী
৪৭ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ

কমিক্‌স

২৩ কয়েন চুরি/ কাজী তাবাস্‌সুম

কবিতায় কয়েন

২৬ বেণীমাধব সরকার/ রমজান আলী রনি
জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া
৩৬ তাশদীদ বীন সিফাত

বর্ষার কবিতা

৪৫ শাশ্বত ওসমান/ ইশরা হোসেন/ সৈয়দ মাশহুদুল হক/ রুদ্র সাদাত
৪৬ আনোয়ারুল হক নূরী/ মনসুর জোয়ারদার/ নেহা হোসেন
আলেয়া বেগম

কবিতার হাট

৩৯ জাহানারা জানি
৪৪ মাহমুদউল্লাহ
৫১ নাহার আহমেদ/ মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ
রবীন্দ্রনাথ অধিকারী/ পারভীন আক্তার লাভলী
৫২ সৈয়দ শরীফ/ সাঈদ তপু/ শামীম শিকদার/ নূরুন
নাহার নাজমা
৫৩ বাতেন বাহার/ মো. রহমত উল্লাহ্‌/ নুসরাত জারিন
৬১ শচীন্দ্র নাথ গাইন

নতুন পড়ুয়াদের জন্য সহজ গপ্‌প

৫৭ বাঘ ও সিংহ/ মাহদি তানিম রেদওয়ান

আঁকা ছবি

২য় প্রচ্ছদ: কাজী নাফিসা
শেষ প্রচ্ছদ: মির্জা মাহের আশেফ
০৩ জয়িতা পাল সিঁথি
৬৩ সোনালি দাস/ মুযাক্কির আহমেদ কাদির
৬৪ তানিসা ইসলাম মিমু/ মাহবুবা রহমান তিশা

শিল্পনির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

ফটোগ্রাফার
মো. নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

কয়েন বা মুদ্রা

বিনিময় ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটে কয়েন বা মুদ্রার। সাধারণ মুদ্রা আজ পরিণত হয়েছে বিট কয়েনে। এখন আমরা চলছি কাগুজে মুদ্রার সঙ্গে। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে মুদ্রার এই বিবর্তন নিয়ে পড়ো প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা।

বন্ধুরা, নবারুণ সহজে পেতে চাইলে ০১৫৩১-৩৮৫১৭৫ নম্বরে বিকাশ করে গ্রাহক চাঁদা দিলেই নবারুণ পৌঁছে যাবে তোমার কাছে।

হাতে কয়েন রাখা ছবিটি এঁকেছে-
জয়িতা পাল সিঁথি, ও পড়ে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণিতে, বসুন্ধরা, ঢাকা।

মুদ্রাহীন বিনিময় ব্যবস্থা

মিনহাজ উদ্দীন আহাম্মদ

মুদ্রা বা কয়েন হলো কোনো দৃশ্যমান বস্তু যা সেবা বা শ্রম বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থায় কয়েনের মাধ্যমে মুদ্রার ক্ষুদ্রতম অংশগুলোকে যেমন- পয়সা, সেন্ট ইত্যাদি ভাগ করা হয়। আমাদের দেশে ২৫ পয়সা থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত কয়েন প্রচলিত আছে। কয়েনকে মুদ্রার প্রথম অবস্থা বলা যায়। আজকের যুগে কাগজি এবং পলিমার মুদ্রার প্রচলনের পূর্বে কয়েনই ছিল প্রাথমিক মুদ্রা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বেও মানুষ কয়েনের ব্যবহার করত তখন বিভিন্ন ধাতব যেমন-সোনা, রূপা, তামা, লোহা এবং বিভিন্ন মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি মুদ্রা দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। আমরা যদি মুদ্রাহীন একটি পৃথিবীর কথা ভাবি তখন কেমন ছিল মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম?

পৃথিবীর প্রাচীন বিলুপ্ত সকল সভ্যতার অনুসন্ধানে দেখা যায় তখন কয়েন হিসেবে মূল্যবান পাথর খণ্ড এবং ধাতব কয়েন ব্যবহার করে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। কয়েন দিয়ে দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা বা শ্রম ক্রয় করা যায় অথচ যখন কয়েন ছিল না তখন মানুষ কী তাহলে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে পারত না ? নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল । এখন আমরা যা কল্পনাও করতে পারি না। আসলে মুদ্রাহীন বিশ্বে প্রাচীন সমাজে এখনকার মতো এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী কিন্তু ছিল না একান্ত জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্য ছাড়া মানুষের আর বেশি কিছু প্রয়োজন হতো না। আর সে সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হতো দ্রব্য বিনিময় প্রথা (Barter System) । কেউ হয়ত গরু পালন করে কিন্তু তার কাছে গম বা ধান নেই সেক্ষেত্রে সে কীভাবে গম পাবে তাকে এমন একজন লোক খুঁজতে হবে যে কিনা গমের বিনিময়ে গরুর দুধ নিবে । তাহলে বুঝতেই পারছ বিষয়টি কতটা জটিল ছিল। তারপরও এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল এবং তা করা হতো একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার জটিলতা যেমন বাড়তে লাগল তেমনি মানুষ প্রয়োজনের নিরিখেই একটি মাধ্যম বের করতে থাকল যা যে– কোনো দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে আর তখনই সহজে ক্ষয় হয় না এবং সংরক্ষণযোগ্য। এমন কিছু মানুষের কাছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। আর সে ধারবাহিকতায় কড়ি, শক্ত সুন্দর পাথর খণ্ড, লোহার খণ্ড ইত্যাদিকে একটি নির্দিষ্ট মান দিয়ে প্রাথমিক বিনিময়ের মাধ্যম করা হলো সে হিসেবে কয়েন-এর পূর্ব প্রজন্ম হলো বিভিন্ন ধাতব খণ্ড। এ ব্যবস্থার হাত ধরে দ্রুতই তা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে আধুনিক সভ্যতায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্য মুদ্রা হিসেবে আবির্ভাব হয়। এখনও বিশ্বের বিভিন্ন উপজাতি এবং প্রত্যন্ত এলাকায় কিছুটা দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এমনকি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড়ি এলাকায় এখনো ধানের বা পুরাতন ব্যবহৃত কাপড়ের বিনিময়ে হাড়িপাতিল বিক্রি করা হয়ে থাকে।

টাকাপয়সার কথা

সালেহা চৌধুরী

আজ যে টাকাপয়সা আমরা দেখছি তা কিন্তু একদিনে হয়নি। দীর্ঘপথ পার হয়ে আজকের টাকাপয়সা এমন রূপ নিয়েছে।

প্রথমে মানে প্রায় তিন হাজার বছর আগে একটা বিশেষ নিয়মে একজন আরেকজনের কাছ থেকে কিছু কিনত। ধরো একজন অনেক মাছ ধরলো কিন্তু তার এত মাছের দরকার নেই। সে তখন তার চেনা একজনকে গিয়ে বলে – মাছগুলো নাও। আমাকে কিছু চাল দাও। বা কোনো একদিন বলে – আমার এই গরুটা নাও। তোমার দুটো ছাগল দাও। এইভাবে দেওয়া-নেওয়ার একটা নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম বা সিস্টেমকে বলে 'বার্টার সিস্টেম'। মানে যাকে বলা যায় জিনিস অদলবদল করা। এটা চলেছে তিন হাজার বছরেরও আগে থেকে। এই দিয়েই সেকালে কোনো কিছু কেনা-বেচা হতো।

যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে তামার টাকার ব্যবহার শুরু হয়। সেটাকে ঠিক আজকের টাকা বলা যাবে না। প্রথমে এক টুকরো তামা, পরে তা কয়েন বা মুদ্রা। চায়নাতে পাথুরে যুগ বা 'স্টোন এজ' শেষ হবার পর পরই তামার টাকার চল হয়। ধাতু যখন পাওয়া গেল সেগুলো দিয়ে কোদাল, শাবল, বল্লম এসবও হতো। এগুলোরও বিনিময় হতো। তারপর টাকার মতো কোনো ভাবনা মাথায় আসে। এই ধাতু বা মেটালের জিনিস বিনিময় শুরু হয়েছিল যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে, তারপর আসে টাকা। লিডিয়ানরা প্রথমে কয়েন তৈরি করে। এই লিডিয়া এখন টার্কি। এরপর রূপার টুকরোকেও টাকার মর্যাদা দেওয়া হয়। যদিও তখন কেউ একে টাকা বা মানি বলে ডাকত না। এইভাবে তামার টুকরো, রুপার টুকরো, সোনার টুকরো হতে হতে একদিন তা কয়েনের আকার পায়। কখনো সেখানে নানা ছবি থাকে কখনো রাজা-রানির ছবি থাকে। মিশরেও একই ব্যাপার ছিল। প্রথমে রূপার টুকরা, আংটি, নৌকা এসব টাকার মতো ব্যবহার হতো। পরে তা কয়েন হয়।

তাই চীন প্রথম কাগজ আবিষ্কার করে। কাজেই ওরা যে কাগজের টাকা তৈরি করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এটা হয়েছিল অনেক আগে। প্রথমে কাগজের সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হয়। সেই সার্টিফিকেটই এক সময় কাগজের টাকা হয়। ব্যবসায়ীরা এই সার্টিফিকেট দিত যার পেছনে থাকত সত্যিকারের সোনা বা রূপা। যেমন – 'আমি ওকে এই কাগজ দিলাম। ও এ দিয়ে ব্যবসা করতে পারবে। কারণ ওর এখন অনেক সোনা ও রূপা আছে। এই সার্টিফিকেটের মূল্য এক টুকরো সোনা'। একজন ব্যবসায়ী আর একজন ব্যবসায়ীকে এইভাবে সার্টিফিকেট দিত।

ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাকার ব্যবহার ছাড়া। কেমন করে? ওদের একটা নিয়ম ছিল তার নাম 'মিতা' সিস্টেম। একজন শ্রমিক ষোলো বছর পর থেকে সম্রাট বা সাম্রাজ্যের জন্য পরিশ্রম করত। তার থাকা, খাওয়া, বাড়িঘর, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছু দেবেন রাজা। কোনো টাকা বা সোনা-রূপা নয়। যদিও সেখানে সোনা-রূপা অনেক ছিল। সেগুলো ওরা দেবতাকে নিবেদন করত। ওরা সোনাকে বলত 'সূর্যের শ্রম ঝরা ঘাম' আর রূপাকে বলত 'চাঁদের চোখের

জল'। এই নিয়ম থাকার ফলে কেউ টাকায় বেতন পায়নি। টাকা ছাড়াই ইনকা সাম্রাজ্য ছিল বিশাল।

অনেক সময় সৈনিকদের সল্ট বা লবণের বস্তা বেতন হিসেবে দেওয়া হতো। কারণ তখন লবণের দাম অনেক, পাওয়া যেত না। আজকে আমরা যে স্যালারি (বেতন) বলি তা এসেছে 'সল্ট' শব্দ থেকে।

এছাড়াও আর একটা জিনিস ব্যবহার করত ব্যবসায়ীরা। একে বলা হয় 'টালি কার্ড। ' মানে দুজনের কাছে এক টুকরো কাঠের সমানভাগ থাকবে। যে টাকা নিয়েছে আর যে টাকা দিয়েছে তাদের দুজনে কাঠের মাঝখানে ভেঙে একজন আরেকজনকে দেবে। এরপর টাকা পরিশোধ করতে এলে দুজনে দুজনের 'টালি কাঠ' দেখে বুঝতে পারবে এবং টাকা পরিশোধ হবে। দুজনের টালি কাঠ যদি খাপে খাপে মিলে যায় তাহলে আর কোনো ভয় নেই। এটা অনেকটা আজকের দিনের ক্রেডিট কার্ডের মতো। ব্রিটেনে এই টালি কাঠের খুব চল ছিল। পরে যখন এই টালি কাঠের ব্যবহার উঠে যায় তখন সব টালি কাঠকে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মনে রাখতে হবে বর্তমানে যে টাকাপয়সা আমরা দেখি তার পেছনে সোনা থাকে। সেই সোনার হিসাব মতো টাকা বানানো হয়। সোনা থাকে টাকশালে বা মিন্টে। এটা যদি না হতো তাহলে লোকজন প্রিন্টিং মেশিনে যখন মনে হতো টাকা ছাপাতো। কেবল দেশের সরকারের অধিকার আছে টাকা বানানোর। তবে এটাও মনে রাখতে হবে টাকা বানাতে গেলে কেবল স্তূপিকৃত সোনা নয় আরো নানা কিছু মূল্যবান জিনিস থাকতে হবে। যেসব সোনার মতোই মূল্যবান। যার কারণে একটা দেশ ধনী বা গরিব হয়। টাকার মূল্য বাড়ে কমে। সৌদি আরবের পেট্রোলিয়ামকে অনেকে

বলে 'লিকুয়িড গোল্ড'। যা বিক্রি করে সৌদি আরব একটি ধনী দেশ। মানুষের পরিশ্রমও সোনার মতো দামি। কখনো এমন হয় সোনার হিসাব বা দেশের সম্পদের হিসাব না করে যখন টাকা ছাপানো হয় তখন বাজারে 'ইনফ্লেশন' বা মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে। একটি দেশের জন্য এমন ঘটনা খুবই খারাপ। জাল নোটও দেশের জন্য খারাপ। আমেরিকায় যেখানে সোনা আছে সে জায়গাটিকে বলে 'ফোর্ট নক্স'। ১৮৩৭ সালে আমেরিকার শার্লোট-এ প্রথম টাকশালা বা মিন্ট হয়।

আমেরিকাতে একবার প্রচুর সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ১৭৯৯ সালে একটি বারো বছরের ছেলে একটা সোনার পাত পেয়েছিল যার ওজন ছিল সতেরো পাউন্ড। ও বুঝতে পারেনি এটা সোনার পাত। বাড়িতে এনে দরজা খোলা রাখবার কাজে ব্যবহার করে। পরে বুঝতে পারে জিনিসটা কী। আমেরিকাতে প্রথম টাকার প্রচার বা মানি সারকুলেশন হয় ১৭৯৩ সালে। তারপর এই সোনা পাওয়া। টাকার পেছনে যে সোনা রাখা হয় তার পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে ওদের সোনা ছাড়া আরো অনেক কিছু আছে যার জন্য টাকার মূল্য বেড়ে গেছে। একটা দেশে অর্থনীতি বা টাকার মূল্য বাড়া-কমার পেছনে কেবল সোনা নয় আরো নানা কিছু থাকতে হয়। যেমন- উৎপাদন, রফতানি, মানুষের শ্রম, কলকারখানা ইত্যাদি।

পাক ভারত উপমহাদেশে যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ছয়শো বছর আগে থেকে নানারকম টাকা ছিল। সেগুলোর উপরে ছবি ছিল। রুপার পাত কেটে এইসব টাকা বানানো হতো। এখন ভারতে টাকাকে বলে রুপি। প্রাচীনকালে ছিল অন্য নাম।

এবারে আমি দশটি দেশের নাম জানাব যাদের টাকার মূল্য অনেক। বাংলাদেশের টাকার বদলে সেই দেশের টাকা নিতে গেলে আমাদের অনেক টাকা দিতে হবে। সেই দেশগুলোর নাম অনুসারে টাকার নাম– (১) কুয়েতি দিনার (২) বাহারাইন দিনার (৩) ওমানি রিয়াল (৪) জর্দানের দিনার (৫) গ্রেট ব্রিটেনের পাউন্ড (৬) জিবরালটার পাউন্ড (৭) কেমানিয়ান ডলার (৮) ইউরো (৯) সুইস ফ্রাংক (১০) ইউ. এস ডলার। এছাড়া আরো নানা দেশের টাকার মূল্য আমাদের টাকার চাইতে বেশি। এবার বলছি দশটি দেশের নাম যাদের টাকার মূল্য আমাদের দেশের চাইতে কম (১) ইরানি রিয়াল (২) ভিয়েতনামের ডং (৩) ইন্দোনেশিয়ার রূপাইয়া (৪) গিনির ফ্রাংক (৫) লাওস-এর কিপ (৬) উজবেকিস্তানের সম (৭) সিয়েরা লিওনের নিওনে (৮) পারাগুয়ের গুয়াবানি (৯) কম্বোডিয়ার রিয়াল (১০) বার্মার কিয়াত। ওই সব দেশে আমাদের টাকা ভাঙাতে গেলে আমরা ভালো টাকা পাব। ভিয়েতনামের তিনশো ডং -এ এক পাউন্ড। আমাদের বাংলাদেশের বারোশো থেকে তেরোশো টাকায় এক পাউন্ড। এবার বুঝতে পারছো তো টাকার মূল্য কমবেশি বলতে আমি কী বলছি। তবে সবসময় এই মূল্য একরকম থাকে না। মূল্য ওঠানামা করে। এক বছর আগে ব্রিটেনের পাউন্ডের যে মূল্য ছিল এখন এর মূল্য অনেক বেশি। একদিন হয়ত বাংলাদেশের টাকার অনেক মূল্য হবে।

নানা দেশের টাকার নানা নাম। কাজ কিন্তু একটাই কেনাবেচা, জমানো, খরচ চালানো। তিন হাজার বছর আগের 'বার্টার সিস্টেমের' চাইতে আজকের টাকা খরচ করা কত সুবিধা। আর এই টাকার কারণে এক দেশ আরেক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে। বস্তা বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে একটা শাবল কেনার দিন শেষ। টাকা এখন জাদুর কাগজ। রাশি রাশি বস্তা বস্তা কয়েন বহন করবার দিনও শেষ। তবে বাজারে এখনো নানা ধরনের কয়েন বা মুদ্রা আছে।

মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য হবার সুবাদে আমাদের ছেলেবেলা কেটে যায় বাবার সাথে আমাদের দোকানে বসে টাকাপয়সা গণনার মধ্য দিয়ে। হিসাবনিকাশ বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয় বাবার সংগ্রহের দেশ-বিদেশের প্রাচীন মুদ্রার ডিজাইন দেখে, নতুন টাকার ঘ্রাণ নিয়ে : আজও এমনই মনে হয় আমার কাছে। এভাবেই আনন্দ-বিনোদনে দিনমান কাটিয়ে দিয়েই বাবার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি ইতিহাসের নানা অজানা অধ্যায়। বাবা ছিলেন বিচিত্র ভুবনের বাসিন্দা। ডাকটিকিট ও স্যুভেনির সংগ্রহ, উপহার বিনিময়, সাহিত্যচর্চা, ফটোগ্রাফি, পত্রমিতালির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি কলমি-বন্ধুদের সাথে পত্রযোগাযোগ, বেতার শ্রোতাসংঘ গঠন করত। ব্যবসায়ের পাশাপাশি এসব শখ পূরণ করা বাবার জন্য সহজসাধ্য ছিল। প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব সেই শৈশবেই আমরা কিছুটা হলেও আঁচ করতে শিখি। আমরা জানি, প্রাচীন মুদ্রা হচ্ছে ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। এক এক ধরনের মুদ্রা যেন এক একটি ইতিহাসের গল্পের ঝুলি নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে। কেবল তাই নয়, প্রাচীন মুদ্রায় ঐ সময়ের একটি এলাকার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রাজভাষা-রাজধর্ম, শিল্প-অর্থনীতি, পশুপাখি এবং জীবন-জীবিকার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাসের ধারক-বাহক। সঙ্গত কারণেই এই মুদ্রা ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে থাকে। মুদ্রা মূলত একটি দেশের স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক রূপ। চীনের দাবি, এক হাজার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে সে দেশে প্রথম ব্রোঞ্জের মুদ্রার প্রচলন হয়। পঞ্চম থেকে সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ভারত, চীন ও ইজিয়ান সাগর তীরবর্তী দেশগুলোতে মুদ্রা উৎপাদন করা হতো। ইজিয়ান মুদ্রা ছিল ধাতব ছাপযুক্ত। তুরস্কের লিডিয়াতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন ভারতেও মুদ্রার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম চীন দেশে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। মুদ্রা সংগ্রহের মাধ্যমে নানা দেশের জীবনাচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মুদ্রা আবিষ্কারের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন। মুদ্রা বর্তমানে ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্সসহ বিভিন্ন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে। মুদ্রা রাজন্যবর্গের চিহ্ন বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। মুদ্রা সংগ্রহ শখের বিষয় হলেও এর গুরুত্ব অনেক। ইতিহাস সংরক্ষণের পাশাপাশি এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বায়েজিদ শাহ আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

মুদ্রার ওজনমান, মুদ্রার বাহ্যিক চেহারা এবং গঠন প্রকৃতি সুলতানি বাংলার মুদ্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বায়েজিদ শাহের মুদ্রা থেকে জানা যায় – তিনি হামযা শাহের পর ৮১৫ থেকে ৮১৭ হিজরি পর্যন্ত নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এটি ফিরোজাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ ও সাতগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রিত হয়। মুদ্রাটির সোজাপিঠে বৃত্তের মধ্যস্থ চতুষ্কোণের মাঝে লেখা হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এবং অপরপিঠে বৃত্তের মাঝে লেখা হয়েছে শিহাব আদ্ দুনিয়া ওয়াদ্ দীন আবুল মুজাফ্ফর বায়জিদ শাহ্ আস্ সুলতান। আলোচ্য স্বর্ণমুদ্রায় বর্ণিত তারিখ এবং টাকশালের নাম থেকে অনুমান করা যায়, ৮১৪ হিজরিতে বায়জিদ শাহ্ রাজধানী ফিরোজাবাদের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।

উয়ারি-বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকায় অবস্থিত দুটি গ্রাম। দীর্ঘকাল যাবৎ এ দুটি গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হাতিয়ার, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, স্বল্প-মূল্যবান পাথর, কাচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, বাটখারা, লৌহনির্মিত প্রত্নবস্তু, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি প্রত্নবস্তু, ইট-নির্মিত স্থাপত্য, চুন-সুরকি নির্মিত রাস্তা, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির নিক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে : উয়ারি-বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি নির্মাণ কেন্দ্র। কাল নির্ণয় পদ্ধতিতে প্রমাণ মিলেছে উয়ারি-বটেশ্বর খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে বিকশিত হয়েছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে দু'ধরনের ছাপাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় : জনপদ শ্রেণিভুক্ত মুদ্রা ও সাম্রাজ্যিক শ্রেণিভুক্ত মুদ্রা। ভারতীয় উপমহাদেশে জনপদ শ্রেণির ছাপাঙ্কিত মুদ্রা খ্রিষ্টপূর্ব ৬– ৪ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ জাতীয় মুদ্রার বৈশিষ্ট্য : মুদ্রার মুখ্য দিকে সাধারণত ৫-এর নিচে ছাপচিহ্ন থাকে। অপরদিকে সাম্রাজ্যিক শ্রেণিভুক্ত মুদ্রাগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৪–২ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এগুলোতে ৫টি ছাপচিহ্ন থাকে। জনপদ শ্রেণির ছাপাঙ্কিত মুদ্রা থেকে জানা যায় : ষষ্ঠ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ কতকগুলো জনপদে (ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা রাজ্য) ও মহাজনপদে (বৃহৎ রাজ্য বা রাষ্ট্র) বিভক্ত ছিল। এসব জনপদের মাঝে শুরসেনা, উত্তর পাঞ্চাল, দক্ষিণ পাঞ্চাল, বৎস, কুণাল, কোশল, কাশী, মল্ল, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, অস্মক, মুলক, অবন্তি, সৌরাষ্ট্র, গান্ধার, কুন্তল, শাক্য, কুরু এবং লৌহিত্য জনপদ ছাপাঙ্কিত মুদ্রা জারি করেছিল। প্রত্যেক জনপদের মুদ্রা ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রাচীন ভারতে জনপদ শ্রেণির ছাপাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনকারী জনপদগুলোর মধ্যে লৌহিত্য (উয়ারি-বটেশ্বর) জনপদের অবস্থান ছিল বাংলাদেশে। এ জাতীয় মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি উপমহাদেশে মুদ্রা প্রচলনের প্রারম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থার প্রমাণ দেয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। উয়ারি-বটেশ্বর দুর্গনগরে ২০০৪ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি মুদ্রা ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। বিরল এই ভাণ্ডারের ওপর গবেষণায় এ অঞ্চলের সুদীর্ঘকালের মুদ্রাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে নতুন কোনো দিগন্তের সূচনা হবে এই আশাই করি।

ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা (খ্রিষ্টপূর্ব ৬-৪ শতক), উয়ারি-বটেশ্বর

তথ্যসূত্র :

১. বসুন্ধরা সিমেন্ট মুদ্রা প্রদর্শনী ২০১৫ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির

২. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি

৩. কিশোর আলো, জানুয়ারি ২০১৪

শখের মুদ্রা

মোস্তাফিজুর রহমান নাঈম

কয়েন একটা শখের জিনিস। শখের জিনিস না হলেই কি আর ১ সেন্টের একটা কয়েন তৈরি করতে আমেরিকা প্রায় আড়াই সেন্ট খরচ করে? এক সেন্ট মানে এক পয়সা। আমাদের দেশে যেমন ১০০ পয়সাতে এক টাকা হয়, আমেরিকাতে ১০০ সেন্টে হয় এক ডলার। তোমরা কি এক পয়সার কয়েন কখনো দেখেছ? ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথম ১৯৭৩ সালে ৫,১০,২৫ এবং ৫০ পয়সার মুদ্রা চালু করে। এক পয়সার মুদ্রা বের হয় ১৯৭৪ সালে। তোমরা হয়ত ভাবছ এখন তো এক টাকা দিয়েই একটা লজেন্সের বেশি পাওয়া যায় না, তখন এক পয়সা দিয়ে কী হতো? তখন এরকম ৮টি পয়সা হলে একটা মিষ্টি কিনে খাওয়া যেত। সেই হিসেবে ১ টাকা হলে তো প্রায় ১২ টার বেশি মিষ্টি কিনে খেতে পারতে। খুব মজা হতো তাই না?

এখনকার দিনে তো কাউকে কয়েন দিলে নিতেই চায় না। পয়সা যে কতটা শখের সে বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝা যায়, যখন আমেরিকান ১ সেন্টের দুটি কয়েনের মূল্য ওঠেছিল ১০ লাখ ডলার। চিন্তা করা যায়? শুধুমাত্র শখের বশে বাংলাদেশের টাকার প্রায় ৮০ লাখ টাকা দিয়ে দুটি কয়েন কিনে কেউ। কয়েন দুটি অবশ্য ১৭৯২ সালের। আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যানাহেইমে মুদ্রা দুটি নিলামে বিক্রি করা হয়। পুরনো পয়সার অনেক মূল্য তাই না? চলো তবে এমন শখের মুদ্রা নিয়ে আরো কিছু জেনে আসি।

ফ্লোইং হেয়ার একটি ১ কোটি ডলার মূল্যের কয়েন। এই সাধারণ মুদ্রাটি ১৭৭৪ সালে আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার পর ইউনাইটেড স্টেট ফেডারেল সরকারের চালু করা প্রথম মুদ্রা। এই মুদ্রার উপর রোমানদের স্বাধীনতার দেবী লিবার্টির মুখাবয়ব এবং তার চারদিকে ১৫ টি তারকা খচিত রয়েছে। আমেরিকাতে তখন ছিল ১৫ টি অঙ্গরাজ্য। কয়েনের ওপরের দিকে লিখা আছে লিবার্টি। এটিই কিন্তু সবচেয়ে দামি মুদ্রা না, এর থেকেও বেশি দাম ওঠেছিল ডবল ঈগলের।

১৮৪৯ সালের একটি মুদ্রা যা পৃথিবীতে একটিই অবশিষ্ট আছে। এই মুদ্রাটির দাম কত জানো? ২ কোটি ডলার। এই মুদ্রাটি দেখতে হলে তোমাকে যেতে হবে স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে।

মুদ্রা সংগ্রহের শখটা অনেক পুরনো। প্রায় দুই হাজার বছর আগে শখের বশে রাজা আর উচ্চ বংশীয় ধনী লোকজন মুদ্রা সংগ্রহ করতেন। এই জন্য রেনেসাঁ কালে মুদ্রা সংগ্রহের শখটাকে রাজার শখ বলা হতো। প্রথমবার মুদ্রা সংগ্রহ শুরু করেছিলেন একজন রাজা। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার বিভিন্ন সম্রাজ্য থেকে প্রথম মুদ্রা সংগ্রহ শুরু করেন। শুধু রাজ-রাজাদেরই মুদ্রার শখ ছিল এমনটা নয়। চতুর্দশ শতকের ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কের সংগ্রহে ছিল নানা ধরনের মুদ্রা।

মুদ্রা হিসেবে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় বর্তমান তুরস্কে। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে। আনাতোলীয় সভ্যতার লাইডিয়ার জনগণ প্রথম ধাতু মুদ্রার প্রচলন করে। কাগজের নোটগুলো এসেছে আরো অনেক পরে। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের মাত্র সাতশ বছর আগে। চীন দেশে প্রথম কাগজের নোট চালু হয়।

মুদ্রার মাধ্যমে জাগ্রত থাকে একেক অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস। তাই মুদ্রাগুলোর আর্থিক দামের থেকে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সম্রাট আকবরের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহটা বুঝা যায় চার কোনার কয়েন কাপলিট দেখে। কাপলিট কয়েনে কিছু কবিতার লাইন খচিত হয়েছিল।

প্রাচীন গান্ধারা সভ্যতার বাঁকানো নৌকা আকৃতির 'ব্যান্ডবার কয়েন', প্রাচীন ভারতের বিজাপুর রাজ্যের চুলের ক্লিপ আকৃতির 'লারিন কয়েন' মধ্যযুগের চট্টগ্রামের বণিকদের তৈরি 'ট্রেড কয়েন' ইতিহাসে অনেক তথ্য যোগ করেছে। তাই তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শুধু মুদ্রার সংগ্রহ নিয়েই জাদুঘর তৈরি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক জাদুঘরগুলোতে দেওয়া হচ্ছে মুদ্রার জন্য আলাদা কক্ষ।

যুগ পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে কয়েনের ধারণা। ওই যে বললাম যুগের সাক্ষ্য বহন করে সে সময়ের কয়েন। এখন তো তথ্য-প্রযুক্তি আর ইলেকট্রনিক্সের যুগ। এ যুগে আছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক মুদ্রা। হাতে ধরা যায় না, দেখা যায় না তবুও এই মুদ্রার দাম স্বর্ণের চেয়েও বেশি। এই মুদ্রাকে বলা হয় বিট কয়েন। ২০০৮ সালে সাতোশি নাকামোতো এই মুদ্রার প্রচলন করেন। বিট কয়েনের লেনদেনটি বিট কয়েন মাইনার নামে একটি সার্ভার কর্তৃক সুরক্ষিত থাকে। বিট কয়েনের দাম নির্দিষ্ট থাকে না, সব সময় ওঠানামা করে। বর্তমানে ১ বিট কয়েনের বাজার দাম প্রায় সাড়ে নয়শত ডলার। ডিপ ওয়েব ও ডার্ক ওয়েবের একমাত্র কারেন্সি এই বিট কয়েন।

দিন যাচ্ছে আর মুদ্রায় আসছে পরিবর্তন। পকেটে রাখা ছোট্ট একটি কয়েন হয়ত পৃথিবীর কোনো এক সময়ে আমাদের এই সময়ের গল্প বলবে। তোমার, আমার, আমাদের গল্প বলবে। একদিন জৈন্তাপুর কয়েন, হরিকেল কয়েনগুলোও তোমাদের মতো কারো কারো হাতে ছিল। এখন সেই মুদ্রাগুলোর স্থান হয়েছে জাদুঘরে অথবা কারো শখের সংগ্রহশালায়। মুদ্রার সাথে শুধু আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক নয়, সম্পর্ক হয় আত্মার হৃদয়ের স্পন্দন থেকে ওঠে আসা এক ভালোবাসার নাম হয়ে ওঠে মুদ্রা; আমাদের শখের মুদ্রা।

বাংলাদেশের মুদ্রার ইতিহাস

খাইরুল ইসলাম (তাজ)

আমাদের দেশে কয়েনের মধ্যে রয়েছে- পাঁচ টাকার কয়েন, দুই টাকার কয়েন, এক টাকার কয়েন, পঞ্চাশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা, দুই পয়সা এবং এক পয়সা; আর, কাগুজে মুদ্রার মধ্যে রয়েছে- এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশ টাকা, পাঁচশত টাকা এবং এক হাজার টাকা।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কিছু সময় পর্যন্ত পাকিস্তানি ১, ৫ এবং ১০ রুপি ব্যবহৃত হয়, তৎকালীন সরকার সেগুলো বাতিল করে দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয়। প্রথমে ১, ৫, ১০ এবং ১০০ টাকার নোট ছাপা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো-

এক টাকা

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন পাকিস্তানি ১ রূপি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশি ১ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৩ সালের ২রা মার্চ প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক সংবলিত ১ টাকার নোট ইস্যু হয়।

এরপর ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পুনরায় আরেকটি ১ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রয়েল বেঙ্গল টাইগার- এর জলছাপ সংবলিত ১

টাকার নোট ইস্যু হয়। এরপর আর কোনো ১ টাকার কাগুজে নোট ইস্যু করা হয়নি। মাঝে অবশ্য ১৯৭৫ সালে নিকেল-কপার দ্বারা তৈরি ১ টাকার কয়েন ইস্যু হয়েছিল।

১৯৯৩ সালের ৯ই মে পুনরায় ১ টাকার কয়েন ইস্যু হয়। পরবর্তীতে এর আকৃতি এবং রং তিন বার পরিবর্তন করা হয়।

দুই টাকা

বাংলাদেশি দুই টাকার নোট ১৯৮৮ সালের ২৯ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় সরকারি নোট ২ টাকা ইস্যু হয়। এরপর আর কোনো ২ টাকার কাগুজে নোট ইস্যু

হয়নি। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে স্টিল-এর তৈরি ২ টাকার কয়েন ইস্যু হয়।

পাঁচ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ প্রথম ৫ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছবি সংবলিত আরো

দুটি নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ই অক্টোবর তারা মসজিদ-এর ছবি সংবলিত ৫ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৮ সালের ২ রা মে তারা মসজিদ- এর পরিবর্তে কুসুমবাগ মসজিদের মেহরাব- এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০৬ সালের ৮ই অক্টোবর, ১৯৭৮ সালের নোটটি আবার ইস্যু হয়। পার্থক্য হলো

নোটটিতে ৩ মি.মি. চওড়া নিরাপত্তা সুতা ব্যবহার করা হয়। মাঝে ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর ৫ টাকার কয়েন ইস্যু হয়।

দশ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ প্রথম ১০ টাকার নোট ইস্যু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২রা জুন এবং ১৯৭৩ সালের ১৫ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান- এর ছবি সংবলিত আরো দুটি নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ই অক্টোবর তারা মসজিদ- এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের ৩রা আগস্ট এবং ১৯৮২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আতিয়া জামে মসজিদ- এর ছবি সংবলিত ভিন্ন দুটি নোট ইস্যু হয়। ১৯৯৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর লালবাগ কেল্লা মসজিদ- এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০ টাকার পলিমার নোট তৈরি করে আনা হয়, অবশ্য তা বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী। ২০০২ সালের ৭ই জানুয়ারি ১০ টাকার আরেকটি নোট ইস্যু হয়। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা উপাদান বাড়িয়ে পুনরায় আগের নোটটি ইস্যু হয়।

বিশ টাকা

১৯৭৯ সালের ২০শে আগস্ট প্রথম ২০ টাকার নোট ইস্যু হয়। পরবর্তীতে হলোগ্রাফিক নিরাপত্তা সংযুক্ত

করে ২০০২ সালের ১৩ ই জুলাই পুনরায় আগের নোটটি ইস্যু হয়।

পঞ্চাশ টাকা

১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ প্রথম ৫০ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৯ সালে তারা মসজিদ-এর পরিবর্তে ষাট

গুম্বুজ মসজিদ-এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ১৯৮৭ সালের ২৪শে আগস্ট প্রথমবারের মতো স্মৃতিসৌধ-এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। এরপর ১৯৯৯ সালের ২২শে আগস্ট ঈষৎ পরিবর্তন করে ২০০৩ সালের ১২ই মে একই নোট ইস্যু হয়।

একশ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ প্রথম ১০০ টাকার নোট ইস্যু হয়। ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছবি সংবলিত এবং ১৯৭৬

সালের ১লা মার্চ তারা মসজিদ-এর ছবি সম্বলিত দুটি একই ডিজাইনের নোট ইস্যু হয়। ১৯৭৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের ১০০ টাকার নোট ইস্যু হয়। ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ অপটিক্যাল ভেরিয়েবল ইঙ্ক ব্যবহার করে নোট ইস্যু হয়। ২০০২ সালের ৫ই জুন স্মৃতিসৌধ- এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০৫ সালের ২৮শে জুলাই পূর্বের ১০০ টাকা শব্দটিকে সোনালি রঙে পরিবর্তন করা হয়।

পাঁচশত টাকা

১৯৭৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রথম ৫০০ টাকার নোট ইস্যু হয়। পরবর্তীতে ডিজাইনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ১৯৯৮ সালের ২রা জুলাই আরেকটি নোট ইস্যু হয়। ২০০০ সালের ১০ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০২

সালের ১৭ই জুলাই স্মৃতিসৌধ- এর ছবি সংবলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০৪ সালের ২৪শে অক্টোবর পূর্বের নোটের ৫০০-এর পরিবর্তে পাঁচশত টাকা শব্দে ব্যবহার করে নোট ইস্যু হয়।

এক হাজার টাকা

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মানের নোট এক হাজার টাকা। নোটটি ২০০৮ সালের ২৭শে অক্টোবর ইস্যু

হয়। এর সামনের অংশে শহিদমিনার এবং পেছনের অংশে কার্জন হলের ছবি রয়েছে। এতে মোট ১১ টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

কয়েনে লেখা ইতিহাস

আব্দুল্লাহ মারজুক

মুদ্রার একক হিসেবে সব দেশেই কয়েন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধ্য যুগে রোমান স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার সবচেয়ে বেশি প্রচলন ছিল। কয়েনের পরই টাকার প্রচলন ঘটে। চীনের মাধ্যমে প্রচলন ঘটে নোটের। প্রাচীন কয়েনগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার শুরু হয় অনেক সময় পরে। বাংলাদেশের কয়েনগুলোরও ইতিহাস রয়েছে। কয়েনের মাধ্যমেও অনেক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। বিভিন্ন দেশের কয়েনগুলোতে তাদের দেশের জনকের ছবি দেখা যায়। বাংলাদেশেও কিছু কয়েন ও কাগুজে নোটে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায়।

ইংরেজ শাসন আমল বা এর আগে প্রচলিত মুদ্রাগুলোয় ষাড়ের ছাপ, ত্রিশুলের ছবি ইত্যাদি ছাপা ছিল। হরিকেল রাজ্যের মুদ্রায় দেখা যায় ১৩০০ বছর পূর্বের চট্টগ্রাম। গান্ধারা সভ্যতা, হরিকেল রাজ্য, সুলতানি আমলের মুদ্রাগুলোয় সে সময়কার সব কিছু মুদ্রায় তুলে ধরেছে। দুর্লভ এ কয়েনগুলো আমাদেরকে অজানা ইতিহাসের জানান দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার দ্বারা জারী প্রথম ডলার মুদ্রা যার মূল্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কয়েন এটি। মানুষের বিভিন্ন রকমের শখ থাকে। কয়েন জমানো বা সংগ্রহ যেন অন্যরকম সেরা একটি শখ। বন্ধুরা, তোমরা কয়েন সংগ্রহের মাধ্যমে জেনে নাও ইতিহাসের সকল খুঁটিনাটি।

দশম শ্রেণি, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

টাকার জাদুঘর

শাহানা আফরোজ

ছোট্ট বন্ধুরা, আমি ছোটোবেলায় একটা ২৫ পয়সা মাটিতে লাগিয়েছিলাম। সেই পয়সা থেকে গাছ হলো। ধরলো অনেক অনেক টাকাপয়সা। তারপর সেই টাকা দিয়ে সবাই খাবার, খেলনা আরো কত কি কিনলাম। কি বিশ্বাস হচ্ছে না বন্ধুরা। তোমরা কি জানো সেই টাকার গাছটি। কিন্তু আজও আছে। যদি টাকার গাছটি দেখতে চাও চলে যাও ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর গোলচক্কর বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির দ্বিতীয় তলায়। মিরপুর ১০ গোলচক্কর থেকে ১০ মিনিট হাঁটলে পাবে।

এতক্ষণ যে টাকার গাছের কথা বললাম সেটি আছে টাকার জাদুঘরে। গাছে ধরে আছে শত শত রেপ্লিকা টাকা। কিন্তু বন্ধুরা, এ টাকা দেখা যাবে, টাকা সম্পর্কে জানা যাবে তবে নেওয়া যাবে না। টাকার গাছ দেখার পাশাপাশি তোমরা দেখবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের টাকা আর মুদ্রা। থরে থরে সাজানো এসব দেখে পৃথিবীর মুদ্রা সম্পর্কে ধারণা হবে খুব সহজেই। টাকা বা মুদ্রার ভাষা নেই তবুও কথা বলে। ইতিহাসের কথা বলে, সাক্ষী দেয় পৃথিবীর ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতির। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে টাকার জাদুঘর অনেক আগেই স্থাপন করা হলেও বাংলাদেশের টাকার জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ২০১৩ সালের ৫ অক্টোবর। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিয়ার রহমান এ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা। টাকার জাদুঘর তোমাদের জন্য খোলা থাকে বুধবার থেকে শনিবার ১১ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। সাপ্তাহিক বন্ধ বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বিকেল ৪টা ধেকে সন্ধ্যা ৭টা। বিনা প্রবেশ মূল্যে ঘুরে আসতে পারো টাকার জাদুঘর থেকে।

আন্তর্জাতিক মানের এ টাকার জাদুঘরে মুদ্রার পাশাপাশি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে প্রাচীন মুদ্রা দ্বারা নির্মিত অলংকার, মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কাঠের বাক্স, লোহার তৈরি কয়েন ব্যাংক এবং লোহার সিন্ধুক প্রভৃতি। এতে রয়েছে দুটো গ্যালারি। গ্যালারি-১ তে রয়েছে, উপমহাদেশের বিভিন্ন শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রা প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, হরিকেলের মুদ্রা, ইন্দো-পার্থিয়ান মুদ্রা, কুশান মুদ্রা, কুচবিহারের মুদ্রা, বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের মুদ্রা, মোগল সম্রাটদের মুদ্রা। আরো রয়েছে মোগল শাসনের সমাপ্তির পর ১৮৩৫ সাল থেকে প্রচলিত ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রা। প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত বেশ কিছু কড়িও প্রদর্শিত হচ্ছে এ গ্যালারিতে।

গ্যালারি-২ তে প্রদর্শিত হচ্ছে বর্তমান সময়ের যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশসহ প্রায় সকল দেশের মুদ্রা।

টাকা পয়সা প্রদর্শনের পাশাপাশি এ জাদুঘরে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তর নানা ধরনের ব্যবহার। এখানে রয়েছে ডিজিটাল সাইনেজ, ডিজিটাল কিয়স্ক, এলইডি টিভি, প্রজেক্টর এবং ফটো কিয়স্ক। ডিজিটাল সাইনেজে টাকা জাদুঘর সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেট তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। ডিজিটাল কিয়স্কের মাধ্যমে মোকসে প্রদর্শিত মুদ্রাগুলোর ভিডিও ও তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির এই কিয়স্কে আঙুলের স্পর্শে মুহূর্তে একের পর এক নোট ও মুদ্রার পরিপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাবে তোমরা।

টাকা জাদুঘরের বড়ো আকর্ষণ ফটো কিয়স্কের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের আবক্ষ ছবি বিশেষ একটি স্যুভেনির নোটে প্রতিস্থাপন করে নেওয়ার ব্যবস্থা। এজন্য তোমাদের ব্যয় করতে হবে ২০ টাকা। কি বন্ধুরা যাবে নাকি টাকার জাদুঘরে।

মুদ্রার জয়যাত্রা

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

লেখাপড়া কিংবা কাজের অবসরে সুযোগ পেলেই শখের বসে আমরা অনেক কাজ করি। কেউ গল্পের বই পড়ি, কেউ বাগান করি, কেউ পাখি পুষি, কেউ কার্টুন, কেউ ডাকটিকিট, রং-বেরঙের বিয়ের কার্ড বা দেশ-বিদেশের মুদ্রা জমাই অথবা ভ্রমণ করি। এগুলোকে বলে শখ, খেয়াল বা 'হবি'।

পয়সা বা মুদ্রা জমানো একটি খুব চিত্তাকর্ষক হবি। এ দ্বারা বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় যেমন- আমাদের দেশে প্রচলিত মুদ্রার নাম টাকা, ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলংকা-মরিতানিয়া ইত্যাদিতে রুপি, বিলাত- মিশর- লেবানন- দক্ষিণ সুদানে পাউন্ড, আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড-তাইওয়ান-হংকং-এ ডলার, ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ডে ফ্রাংক, চিলিতে পেসো, থাইল্যান্ডে বাথ, জাপানে ইয়েন, রাশিয়াতে রুবেল, চীনে রেনমিনবি, মালয়েশিয়ায়-রিংগিত, চেকোস্লোভাকিয়া- সুইডেনে ক্রোনার, ইতালি-তুরস্কে লিরা, সৌদিআরব- কাতারে রিয়াল, আরব আমিরাতে দিরহাম, লিবিয়া- কুয়েতে দিনার, দক্ষিণ আফ্রিকায় র‍্যান্ড ইত্যাদি। কোনো কিছু কিনতে হলেই টাকা-পয়সা অর্থাৎ মুদ্রা লাগে। বহু আগে এমন এক সময় ছিল যখন মুদ্রা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তখন মানুষ কীভাবে বাজার-হাট করতো? কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে টাকা-পয়সা ছাড়া কীভাবে তা জোগাড় করতো? হ্যাঁ, সেই সুদূর অতীতে ছিল বিনিময় প্রথা। যার কাছে যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে তা দিয়ে অন্য একজনের কাছে যা অতিরিক্ত আছে এমন প্রয়োজনীয় কিছু নিয়ে আসতো। যেমন- একজনের বাড়িতে অনেক লাউ গাছ আছে কিন্তু ধান ক্ষেত অর্থাৎ ভাত খাবার বন্দোবস্ত নেই, সে হয়ত যার বাড়িতে চাল আছে তাকে দুইটা লাউ দিয়ে এক কেজি চাল নিয়ে আসলো।

খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০০-৬০০০ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো গবাদি পশুকে। বিশেষত গরুকে একক ধরে তার বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনা-বেচা হতো। যেমন আমার কাপড়ের প্রয়োজন কিন্তু তা বানাতে পারি না, আমি এমন একজনের কাছে গেলাম যার কাপড় আছে কিন্তু গবাদি পশু নেই। তাকে একটি ছাগল বা গরু দিয়ে কাপড়টি নিয়ে আসলাম। এমনকি এখনো পৃথিবীর কোনো কোনো অনুন্নত স্থানে বিনিময় প্রথা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমার বাবা ডা. মো.আইয়ুব মিয়া আসাম রাইফেলস বাহিনীর সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ান -এর চিকিৎসা কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৪৫-এর দিকে তাঁর পোস্টিং ছিল ভারতের অরুণাচলের পাসিঘাটে। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশদের অধীন। সেখানের পাহাড়ে সে সময় আদিবাসী বাস করতো। এদেরকে ব্রিটিশরা ডাকতো 'আবর' বলে। তারা ব্রিটিশ রাজ্যের অধীন হয়েও তাদের অর্থাৎ তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করতো না। বাবা পড়ে গিয়েছিলেন খুব মুশকিলে। তিনি বেতন পেতেন ব্রিটিশ-ভারতের মুদ্রায় আর বাজার-হাট সব ছিল আদিবাসীদের দখলে। তারাই সেখানে বিক্রেতা। ফলে তার পক্ষে কিছুই কেনা সম্ভব হতো না। পরে তিনি লক্ষ করলেন আদিবাসীরা সবাই নিজের কাপড়

বানায় ও সেলাই করে কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন যে সুঁই তা তারা তৈরি করতে পারে না। এরপর থেকে তিনি সুঁই সংগ্রহ করে রাখতেন এবং সুঁই-এর বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। এ কাহিনি আমার বাবার কাছ থেকে শোনা ।

কয়েন বা মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব সাতশত শতকে। কেউ বলেন তা প্রথম প্রবর্তিত হয় ইজিনা (Aegina) দ্বীপে আর অন্যদের মতে ইফেসাস (Ephesus) বা লিডিয়াতে (Lydia)। এ নিয়ে মতভেদ আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালে চীনে কেনাবেচায় কড়ি এবং শঙ্খের প্রচলন হয়। এক সময় তার অভাব দেখা দেয়, এর ফলে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সনে সেখানে কড়ির পরিবর্তে রুপা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি নকল কড়ি ব্যবহার করা হতো। আমাদের দেশেও একসময় টাকা-পয়সা প্রচলনের আগে কড়ি ব্যবহার করা হতো। ছোটোবেলায় আমাদেরকে ধারাপাতে কড়াকিয়া মুখস্থ করতে হয়েছে। যতটুকু জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে চীনে ধাতব কিছুর বিনিময়ে বাজারে কেনা-বেচা শুরু হয়। ছোটো ছোটো চাকু বা অন্য কোনো ধাতব যন্ত্রের বদলে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হতো। এগুলো মুদ্রা না হলেও ধাতব মুদ্রার শুরুটা ছিল এ রকম। ক্রমে গোলাকার চৈনিক মুদ্রা তৈরি করা হতো। পশ্চিমা জগতে প্রথম মুদ্রা যা লিডিয়া মুদ্রা (Lydia Coin) নামে বিখ্যাত তা আজকের তুরস্কে তৈরি হয়েছিল। তাতে সিংহের ছাপ থাকতো। এগুলো ছিল সোনার। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে রাজা ক্রেসাস (Croesus)-এর জন্য তা তৈরি করা হতো। সম্রাট কুবলাই খান তেরো শতকে চীনে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন। অতীতে পারস্য সম্রাজ্যে মুদ্রাকে বলা হতো ডারিক (Daric) আর গ্রিসে ড্রাকমা (Drachma)। এখনো সেখানে মুদ্রার নাম ড্রাকমা। রোমের পতনের পর বাইজেন্টাইন সম্রাজ্যে মুদ্রার নাম ছিল সলিডাস (solidus)।

মুদ্রা তৈরির ব্যাপারে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে লৌহ যুগের মহাজনপদ রাজ্যে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রবর্তিত হয় এবং তা মৌর্য যুগ পর্যন্ত চালু ছিল। ভারতীয় গ্রিকরা পরে নতুন মুদ্রা চালু করেন এ দেশে। তৃতীয় শতকে কুশান সম্রাজে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। মোগল ও রাজপুত্ররাও এ দেশে মুদ্রা অব্যাহত রাখেন। ভারত

সম্রাট শের খান সুরী (১৫৪০-১৫৪৫) তাঁর পাঁচ বছর রাজত্বকালে নতুন রৌপ্য মুদ্রা ছাড়েন যার নাম দেন 'রুপাইয়া'। সম্ভবত রুপা থেকে তৈরি বলেই এ নাম দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে 'রুপি' চালু আছে। যাকে উর্দু এবং হিন্দিতে আজো রুপাইয়া বলে তা আসলে তিনিই চালু করেছিলেন। ইন্দোনেশিয়াতে এখনো প্রচলিত মুদ্রাকে বলে রুপিয়া।

সুদূর অতীত থেকে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত আছে তাই তার নমুনা সংগ্রহে রাখা সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় হবি। আমিও সুযোগ পেলে সংগ্রহ করি। কে কত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। মুদ্রাটির মূল্যমান কত তা মুখ্য নয়। প্রাচীন মুদ্রা আমাদেরকে অতীতের সভ্যতা, সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে তার নীরব ভাষায়। আজকাল আর হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মুদ্রা বানাতে হয় না কষ্ট করে। আধুনিক যন্ত্র দিয়ে প্রতি মিনিটে প্রায় ১৭৫০টি মুদ্রা বানানো যায়।

সায়েন্স ফিকশন

পার্থিব স্মারক কয়েন

সৌর শাইন

কয়েনটা দখলের জন্য আমরা অভিযান চালিয়েছি। কিন্তু..মহামান্য। এতটুকু বলে থমকে গেল।

কিন্তু আবার কী? কিষণ গ্রহের মহাপ্রশাসক সিপর মেগের প্রশ্ন। যে-কোনো মূল্যে কয়েনটা আমাদের দখলে আনতে হবে। বুঝলে তো?

যথা আজ্ঞা মহামান্য। যদিও ত্রিচক্র ব্লক নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু গোয়েন্দা বিভাগ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমাদের 'আলোক শক্তি' অধিদপ্তরও এ ব্যাপারে সজাগ আছে।

শুভ সংবাদ তবে। যে-কোনো প্রয়োজনে আক্রমণের আগাম অনুমতি দেওয়া হলো। মঙ্গলের সর্বশেষ মূল্যবান সম্পদটি কেবলই আমাদের অধীনে থাকবে। এতটুকু মনে রেখো।

জ্বি মহামান্য। নিরাপত্তা প্রশাসক চলে গেল।

এদিকে সিপর মেগ ভাবতে লাগলেন কী কৌশলে কয়েনটা দখল করা যায়। এ মূল্যবান বস্তুটি কেন্দ্র হয়ত ভয়ানক যুদ্ধও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু 'কিষণ' গ্রহ এ ক্ষেত্রে একচুলও পিছু হটবে না। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রহের সুপিরিয়রগণ কয়েনটির স্বত্বাধিকার দাবি তুলেছে।

পৃথিবী ধ্বংসের পর বহুকাল কেটেছে। মানবজাতি সৌরজগতে ও মিল্কিওয়ের বাইরে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে আশ্রয় নিয়েছে। গড়ে তুলেছে বিচিত্র নিবাস। গত শতাব্দীতে মঙ্গলগ্রহ স্মরণ অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম ইতিহাস বিজ্ঞানী থিপিন পল একটি কয়েনের কথা প্রকাশ করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, দীর্ঘদিন প্রাগৈতিহাসিক বই থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে একটি পার্থিব স্মারক কয়েনের তথ্য পেয়েছি। ওটা একটি মঙ্গোলীয় কয়েন। যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলে আমাদের বর্তমান মানব ইতিহাসে হবে নতুন সাফল্য সংযোজন। থিপিন পল কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের রেফারেন্সে বলেন, পৃথিবী ধ্বংসের পর, মানুষ মঙ্গলগ্রহে নিশ্চিতভাবে বসবাস শুরু করে। তখনকার মঙ্গোলীয় সুপিরিয়র পৃথিবীর স্মৃতিতে এক ধরনের সোনালি ধাতব মুদ্রার প্রচলন চালু করেন। যেখানে একপাশে পৃথিবীর মানচিত্র, অন্যপাশে ছিল সৌর জগতের চিত্র। সময়ের গতিপথ মঙ্গলগ্রহের জন্যও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাই মানবজাতিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মহাজগতের নানা প্রান্তে ছুটে যেতে হয়েছে। সে সময় একজন ব্যক্তি কেবল মঙ্গলগ্রহ ছেড়ে যেতে রাজি হননি। তিনি ঐ সময়কার বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক জুরিও যোপ। প্রিয় জন্মভূমিকে ভালোবেসে মৃত্যু অবধি একা মঙ্গলে বসবাস করেছেন। তারপর গত হলো অনেক সময়।

এদিকে মানবজাতি বহুকাল পর্যন্ত মহাশূন্যে যাযাবর জীবনযাপন করেছে। অতঃপর ত্রিচক্র ব্লকের একটি উপগ্রহে ওরা উপনিবেশ গড়ে তোলে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে সকল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেয়। সেখান থেকে তারপর অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও বসবাস শুরু করে। অন্যদিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মিথের মতো জুরিও যোপের নাম প্রচার হয়ে আসতে থাকে।

এ নামটি এক সময় গোটা মানবজাতির মধ্যে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে। কারণ তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই ছিল যুগের পর যুগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

থিপিন পল এক গ্লাস পানি পান করে আবার বক্তব্য শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, কৌতূহল থেকেই কয়েকটি গ্রহ জোট বেঁধে মঙ্গল অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যয়বহুল হলেও মানুষজন সে অভিযানের পক্ষে সাড়া দেয় এবং সবাই জুরিও যোপের দেহাবশেষ সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করার পরামর্শ দেয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরপরই শুরু হয় কাঙ্ক্ষিত অভিযান। দীর্ঘযাত্রা শেষে নভোচারীরা মঙ্গলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই ওরা জুরিও যোপের বসবাসস্থল চিহ্নিত করে। সে এলাকাজুড়ে শুরু হয় টি-রে রশ্মির প্রতিফলন অভিযান। টি-রে রশ্মির সাহায্যে হিমশৈলীর ভেতর একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। নভোচারীরা স্থান নির্ধারণ করে বরফ কাটতে শুরু করে। গভীর খননের পর উঠে আসে একটি মানবদেহ। যা ছিল জুরিও যোপের অক্ষত মৃতদেহ।

ত্রিচক্র ব্লকে ফিরে আসার পর জুরিও যোপকে মর্যাদার সাথে সমাধি দেওয়া হয়। এই পুরো ঘটনার মাঝে ঘটে যায় আরেকটি ঘটনা। নভোচারীদের মধ্যে একজনের নাম নেসেল জিপ। তিনি জুরিও যোপের প্রাচীন জামার পকেটে একটি কয়েন খুঁজে পান। সবার অলক্ষে কয়েনটি তিনি নিজের কাছে রাখেন। নেসেল জিপ কেবল পরিবারের সদস্যদের কাছে কয়েনের কথা প্রকাশ করেছিলেন। সময় গড়িয়ে কয়েনটি কয়েক প্রজন্মের কাছে হাতবদল ঘটে। এক সময় বিষয়টি সবার কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এখনো জানা যায়টি কয়েনটি কোথায় আছে? কার কাছে আছে?

ইতিহাস বিজ্ঞানী থিপিন পলের এ বক্তব্যের পর থেকে সবার কাছে কয়েন প্রশ্নটি ঘুরপাক খেতে থাকে। গত এক শতাব্দী ধরে চলতে থাকে অনুসন্ধান। জুরিও যোপ ও কয়েনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বহু কল্পসাহিত্য, নাটক-সিনেমা প্রভৃতি। অনেক চিন্তাবিদ এটাকে মহারহস্য বলে স্বীকৃতি দেন। নিরাশ হয়ে অনেকে অভিমত দেন এ কয়েন কখনোই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বহু পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের পর ত্রিচক্র ব্লকেরই এক অন্ধ ভিক্ষুকের কাছ থেকে পাওয়া যায় কয়েনটি। তারপর থেকে এ ঐতিহাসিক কয়েনটির স্বত্বাধিকার নিয়ে চলছে তুমুল স্নায়ু যুদ্ধ। বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের প্রধান শাসকগণ এর উপর দাবি তুলেছেন। কিন্তু ত্রিচক্র ব্লক কিছুতেই কয়েনটি হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। যার ফলে 'কিষণ গ্রহ' ত্রিচক্র ব্লকে প্রকাশ্যে হামলার ঘোষণা দিয়েছে।

ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থা!

অভিযোগটা 'কিষণ' গ্রহের মহাপ্রশাসক সিপর মেগের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহের প্রতি অন্যায় আচরণ। গ্রহসংঘের সৌর বার্ষিক অধিবেশনে অভিযোগটি উত্থাপন করেছে ত্রিচক্র ব্লকের সুপিরিয়ররা। ত্রিচক্র ব্লকে তিনটি উপগ্রহ 'সুপ্তি' 'ঝঞ্ঝা' ও 'ছন্দা'। তাদের দাবি, সিপর মেগ অন্যায়ভাবে ত্রিচক্রে অদৃশ্য হামলার নির্দেশ দিয়েছে। আলোকশক্তির সাহায্যে বিকল করে দিয়েছে অজস্র অবকাঠামো। এ অপরাধের ন্যায্য শাস্তির দাবি তুলে ত্রিচক্র ব্লক।

'সার্বভৌম গ্রহ-উপগ্রহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ'। এই আইনটি গত অধিবেশনে গেজেট আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'কিষণ' গ্রহ তা সর্বপ্রথম অমান্য করল। এ আচরণে অন্যান্য গ্রহের সুপিরিয়রগণও ক্ষুব্ধ!

গ্রহসংঘের মহাপরিচালক সবার মতামত নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এবং খুব দ্রুত রিপোর্ট প্রদানের উপর জোর দেন।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে 'কিষণ গ্রহ' তথা সিপর মেগের উগ্র আচরণ প্রমাণিত হয়। আর এর পেছনে কারণ হিসেবে উঠে আসে বহুল আলোচিত পার্থিব স্মারক কয়েন। যেখানে লুকিয়ে আছে সিপর মেগের একটি বিশেষ শখ। না, যুদ্ধ করাটা তার শখ নয়। শখ হলো ভিন্ন ভিন্ন কয়েন সংগ্রহ করা। এ ঝোঁকটি সিপর মেগের মধ্যে শৈশব থেকে ছিল বলে জানা যায়।

গ্রহসংঘের মহাপরিচালক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেন। যা সুপিরিয়রদের নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে। আরোপিত সিদ্ধান্ত হলো, আলোচিত কয়েনটির উপর কোনো গ্রহ-উপগ্রহের সত্তা দাবি করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এ কয়েনটি গোটা মানবজাতির সম্পদ। তাই এটি সুরক্ষিত রাখা হবে 'মানব জাদুঘরে'। যে জাদুঘরে মানবজাতির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন শোভা পাচ্ছে।

গ্রহসংঘের এ প্রস্তাব মেনে নেবার পর থেকে থেমে যায় যুদ্ধ। সূচনা হয় নতুন যুগের। আর প্রাপ্য সম্মান লাভ করে 'পার্থিব স্মারক কয়েন'।

বাংলাদেশে কয়েনের ব্যবহার

শামসুজ্জামান শামস

কয়েন বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ। একসময় সভ্যতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কয়েনের মাধ্যমে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হতো। কয়েক বছর আগেও সিকি আধুলিতেই পাওয়া যেত শখের লজেন্স, বাদাম, নানা পদের আচার। ছোটো ছোটো লেনদেনগুলোতে ব্যবহার হতো সিকি-আধুলি। অথচ মূল্যস্ফীতির ক্রমাগত চাপে হারিয়ে গেছে এক সময়ের প্রতিদিনকার সঙ্গী ১, ৫, ১০ পয়সার মুদ্রাসহ ২৫ এবং ৫০ পয়সার সিকি-আধুলি। উন্নত বিশ্বে এখনো কয়েন জনপ্রিয় হলেও আমাদের দেশে বর্তমানে কয়েনের ব্যবহার কমে গেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর বাংলাদেশে পাকিস্তানি মুদ্রায় লেনদেন হতো। এরপর থেকে বিভিন্ন মূল্যমানের কয়েন বাজারে ছাড়তে শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব পয়সার গায়ে থাকত ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বপ্ন। কোনো পয়সায় পরিবার পরিকল্পনার স্লোগানের অংশ হিসেবে থাকত সুখী পরিবারের প্রতিচ্ছবি (দুই সন্তানসহ চার সদস্যের পরিবার), কোনোটিতে থাকত অর্থনীতির প্রাণ কৃষকের লাঙল ও কারখানার চাকা। আবার কোনো কোনো ধাতব মুদ্রার গায়ে ছিল সবুজ বিপ্লব ও গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করার প্রতীক। ছিল কবুতর, মুরগি, মাছ, ডিম, কলা, আনারসের মতো বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যের ছবিও। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, যে কোনো দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় কম মূল্যমানের মুদ্রা বেশি থাকে। কারণ সাধারণ খুচরা কেনাকাটায় ভাংতির প্রয়োজন হয় বেশি। তাই স্বাধীনতার পর কয়েক বছর ধরে বিপুল পরিমাণ কয়েন বাজারে ছাড়া হয়। বিভিন্ন সময় এসব ধাতব মুদ্রার আকৃতি ও নকশা বদল হয়। কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যহীন হয়ে পড়ায় এসব কয়েনের প্রচলন কমে এসেছে।

অনেক অনেক বছর আগে পণ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজনে মুদ্রার প্রচলন হয়। প্রাচীন যুগে ব্যবসায়িক অর্থে কয়েনের ব্যবহার ছিল। ধারণা করা হয় কয়েনগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং কার্তুজ ও বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি হতো। সাম্রাজ্যগুলো সমৃদ্ধ হতে শুরু করায়, তারা সোনায় তৈরি কয়েন চালু করে। এটি ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের মাটিতে পা দেয়। ব্রিটিশ শাসনামলে যে কয়েনগুলো চালু হয় সেগুলোকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েন যা ১৮৩৫ সালের আগে চালু হয় এবং পরবর্তী অধ্যায় হলো সেই সাম্রাজ্যিক যুগ যখন ভারত সরাসরি ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীনে শাসিত হতো। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ শাসক রাজা ও রানির ছবি খোদাই করা প্রথম সোনার কয়েন আনে, যা মোহর (সোনার কয়েন) নামে পরিচিত ছিল। ১১.৬৬ গ্রাম বা ০.৯১৬৭

বিশুদ্ধতা সমেত এক 'তোলা' ওজনের কয়েনগুলো ভারতীয় ব্যবসায় বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল।

বর্তমানে মূল্যস্ফীতির চাপে হারিয়ে যাচ্ছে কয়েন। উন্নত বিশ্বে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার খুব জনপ্রিয়। কোনো কোনো দেশে ১ সেন্টের পয়সাও ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতি আর আধুনিকতার চাপে বর্তমানে কয়েনের ব্যবহার প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ এক সময় কয়েনই ছিল বাংলাদেশের জনপ্রিয় মুদ্রা। ভারতেও নানা সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া নানান ধরনের মুদ্রার আবিষ্কার জনসমক্ষে এনেছে। ১০, ৫০, ১০০, ১০০০ টাকার কয়েন রিজার্ভ ব্যাংক তৈরি করেছে নানা উপলক্ষে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজ চলাকালে ভারতীয় মুদ্রা তৈরি হতো রুপা দিয়ে, সেই কারণে ভারতীয় মুদ্রাকে সিলভার কয়েনও বলা হয়। বাংলাদেশে পয়সা ও টাকার আট ধরনের কয়েন থাকলেও এখন তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে পাঁচ টাকার কয়েন। এক এবং দুই টাকার কয়েনও ব্যবহার হচ্ছে।

১, ৫, ১০, ২৫ ও ৫০ পয়সা এখন আর তেমন দেখা যায় না। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ১ টাকার একটি কয়েন তৈরি করতে ৯৫ পয়সা খরচ হয়। ২ টাকা কয়েনে ১ টাকা ২০ পয়সা খরচ হয়। আর ৫ টাকার একটি কয়েন তৈরিতে খরচ পড়ে ১ টাকা ৯৫ পয়সা। কয়েনের মান বেশি হলে সে তুলনায় খরচ অনেক কম পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে সবচেয়ে কম মূল্যমানের এবং সবচেয়ে ছোটো আকৃতির ধাতব মুদ্রা হিসেবে এক পয়সার কয়েন চালু হয় বাংলাদেশে। অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি বৃত্তাকার এই মুদ্রার এক পাশে ফ্লোরাল অর্নামেন্টাল ডিজাইন ও অন্য পাশে ছিল বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক শাপলা ফুল। এর আগে ১৯৭৩ সালে প্রথম ধাতব মুদ্রা হিসেবে পাঁচ পয়সা ও ১০ পয়সার কয়েন চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে পাঁচ পয়সার কয়েনটি ছিল অ্যালুমিনিয়ামে নির্মিত চার কোনাবিশিষ্ট। ১৯ মিলিমিটার ব্যাসের এই মুদ্রার ওজন ছিল ১ দশমিক ৪ গ্রাম। এই মুদ্রার এক পাশে লাঙল ও কারখানার চাকা এবং অন্য পাশে ছিল শাপলা ফুলের নকশা। পাঁচ পয়সা ও ১০ পয়সার কয়েন বাজারে আসার পর এক পয়সার কয়েন ছাড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেনাকাটা ও লেনদেনে তখন এক পয়সার ব্যাপক চাহিদা ছিল। ১৯৭৭ সালে পাঁচ পয়সার কয়েনের আকৃতি ও নকশায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। আট কোনাবিশিষ্ট ১০ পয়সার মুদ্রাও অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি। ২৩ মিলিমিটার ব্যাসের এই কয়েনের ওজন ছিল ১ দশমিক ৯৮ গ্রাম। এর এক পাশে পানপাতা ও অন্য পাশে ছিল শাপলা ফুল। ১৯৭৪ সালে নকশা বদলে এক পাশে সবুজ বিপ্লব স্লোগান এবং সংশ্লিষ্ট লোগো ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৭ সালে নকশা আবারও পরিবর্তন করে এক পাশে দুই সন্তানবিশিষ্ট একটি পরিবারের ছবি আনা হয়। ১৯৮১ সালে এই মুদ্রার ব্যাস কমিয়ে ২২ মিলিমিটার এবং ওজন কমিয়ে ১ দশমিক ৩৯ গ্রাম করা হয়।

স্টিল দিয়ে নির্মিত ২৫ পয়সার বৃত্তাকার ধাতব মুদ্রা ১৯৭৩ সালে ইস্যু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৯ মিলিমিটার ব্যাসের এই কয়েনের ওজন ছিল ২ দশমিক ৭ গ্রাম। এর এক পাশে রুই মাছ এবং অন্য পাশে জাতীয় প্রতীক শাপলা ফুলের ছবি ছিল। ১৯৭৪ সালে রুই মাছের বদলে মাছ, ডিম, কলা ও লাউয়ের ছবি যোগ করা হয়। এরপর ১৯৭৭ সালে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি বসানো হয় এক পাশে, অন্য পাশে ঠিকই থেকে যায় শাপলার ছবি।

১৯৭৩ সালে ইস্যু করা স্টিলে নির্মিত ৫০ পয়সার বৃত্তাকার মুদ্রাও গুরুত্ব হারিয়েছে। ২২ মিলিমিটার ব্যাসের এই মুদ্রার ওজন ছিল ৪ দশমিক ১ গ্রাম। এর এক পাশে কবুতর ও অন্য পাশে ছিল শাপলার ছবি। পরে ১৯৭৭ সালে ডিজাইনে পরিবর্তন এনে কবুতরের বদলে ইলিশ মাছ, মুরগি, কলা ও আনারসের ছবি যোগ করা হয়। এরপর ২০০১ সালে নকশা অপরিবর্তিত রেখে বৃত্তাকার আকৃতি থেকে অষ্টভুজ করা হয় মুদ্রাটি।

মুদ্রাতত্ত্ব, মুদ্রাতথ্য

চান্দ্রেয়ী পাল মম

আচ্ছা, তোমরা কি জানো, মুদ্রা বা কয়েন আসলে কি? এটা দিয়ে কি কি কাজ করা হয় বা এটি কোথা থেকে এসেছে? চল আজ এ ব্যাপারে একটু জানার চেষ্টা করি।

মুদ্রা মূলত হচ্ছে কোনো পণ্য বা সেবা আদান প্রদানের জন্য একটি বিনিময় মাধ্যম। এটি হলো এক প্রকার অর্থ। অর্থ দ্বারাই আমরা বিভিন্ন বস্তু বা সেবা কেনাবেচা করে থাকি।

মূলত মুদ্রা দেখতে কেমন তা কি আমরা জানি? অবশ্যই জানি। মুদ্রা হচ্ছে একটি ধাতব খণ্ড। আর সেই ধাতব খণ্ডে একেকটি দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীক, নকশা ইত্যাদি খোদাই করা থাকে। এর দুটি পিঠ। দুই পিঠেই বিভিন্ন নকশা এবং সেই মুদ্রার পরিমাণ দেওয়া থাকে। বাংলায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে কড়ির ব্যবহার ছিল। তখনও ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হতো না। তবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে বাংলায় ধাতব মুদ্রার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র যেমন, মহাস্থানগড় (বাংলাদেশ), বাণগড় (দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ), মঙ্গলকোট (বর্ধমান জেলা) ইত্যাদি স্থান থেকে প্রাচীন মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে। বেশিরভাগই কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা। ইতিহাসের পাতায় অনেক সুলতান এবং সম্রাটের নাম পাওয়া গেছে যারা স্বর্ণমুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন। বর্তমানে ধাতব মুদ্রার পাশাপাশি কাগুজে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে একেক দেশের মুদ্রার নাম একেক রকম। এছাড়া মুদ্রার আকার ও ধরনেও রয়েছে ভিন্নতা। চল, কিছু দেশের মুদ্রার নাম জেনে নেই।

বাংলাদেশের মুদ্রার নাম হলো 'টাকা'। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশ যেমন- ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার মুদ্রার নাম 'রুপি'। মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা হচ্ছে 'রুপাইয়া'। ভুটানের মুদ্রা হলো 'গুলট্রাম'। মিয়ানমারের মুদ্রা 'কিয়াট'। ভিয়েতনামের মুদ্রা 'ডং'। থাইল্যান্ডের হচ্ছে 'বাথ'। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বেশিরভাগের মুদ্রা রিয়াল বা দিনার। যেমন-সৌদি আরব, ইরান, ইয়েমেন, ওমান, কাতার ইত্যাদি দেশের মুদ্রা 'রিয়াল'। আবার বসনিয়া, লিবিয়া এদের মুদ্রা 'দিনার'। জাপানের মুদ্রা 'ইয়েন', জার্মানির মুদ্রা 'ইউরো', ব্রিটেনের মুদ্রা 'স্টার্লিং'। সুদান, সিরিয়া, মিসরের মুদ্রা 'পাউন্ড'। নাইজেরিয়ার মুদ্রা 'নাইরো'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, জ্যামাইকা, ব্রুনাই ইত্যাদি আরো বেশ কিছু দেশের মুদ্রার নাম 'ডলার'। পৃথিবীর এত এত দেশের কত্ত রকমের মুদ্রা রয়েছে দেখলে?

মুদ্রা এবং বিনিময়ের মাধ্যম নিয়ে কিছু মজার তথ্য জেনে নেই। -

১. বহু দেশের রয়েছে নিজস্ব এবং একক টাকা যেমন রয়েছে, তেমনি বেশ কিছু দেশের টাকা কিন্তু নিজস্ব নয়- অন্য দেশের সঙ্গে ভাগাভাগি করা। যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেনের মতো দেশগুলোতে এখন ইউরো ব্যবহার হয়। আমরা যখন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম জানছিলাম, তখন হয়ত তোমরা ব্যাপারটা খেয়াল করেছ।

২. বিশ্বে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয় মার্কিন ডলার। এরপর ইউরো, জাপানি ইয়েন ও ব্রিটিশ পাউন্ড।

৩. আনুমানিক ১০ হাজার বছর আগে গবাদি পশু এবং ফসলই বিনিময়ের মূল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

৪. প্রথম মুদ্রা তৈরি হয় মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে।

৫. এক হাজার বছর আগে চীনে প্রথম কাগজের নোট ব্যবহৃত হয়।

৬. একটি ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যমান হলো ওজনে এক পাউন্ড রূপার সমান।

মুদ্রার ব্যবহার অনেক। আমাদের জীবনযাত্রায় তাই এর প্রয়োজনটা অনেক বেশি। এই দরকারি জিনিসটা সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিলাম আমরা। ভালো হলো না? সবাই খুব ভালো থেকো।

স্নাতক প্রথম বর্ষ, কলেজ অব হোম ইকোনমিক্স, আজিমপুর, ঢাকা।

কমিকস্

লেখা ও আঁকা
কাজী তাবাস্‌সুম

স্মৃতিতে-প্রীতিতে কয়েন

মোমিন মেহেদী

আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিবেদিতজনদের কাছ থেকে শুনেছি–কয়েন বা মুদ্রা সব সময় বিনিময় কাজে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন মুদ্রা ইতিহাসের কালের সাক্ষী হয়ে আছে। সভ্যতা শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অবাক করা মুদ্রার ডিজাইন বিভিন্ন বার্তা বহন করে। আর তাই এই কয়েন সংগ্রহ করে একই সাথে যেমন জানা যায় অনেক কিছু, তেমনি নিজের ভিন্নতাও তৈরি হয় অসংখ্য মানুষের মাঝে। সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে যায় পৃথিবী আর সেই এগিয়ে নেওয়ার জন্য কয়েন বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে ধরছি তোমাদের জন্য।

স্পিনট্রিয়া, রোমান মুদ্রা : ১ থেকে ১৬ অংক বিশিষ্ট এ ধাতব মুদ্রা সাধারণত বিশেষ কোনো পল্লিতে ব্যবহৃত হতো। ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরি এ মুদ্রার এক পিঠে ছিল মূল্য সংখ্যা ও অন্যদিকে দৃশ্য। তবে এ মুদ্রার ব্যবহারের গোপন কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন।

অ্যাঞ্জেল কয়েন, ব্রিটেন: ১৮শ শতকে ব্রিটেনে অনেক রোগী দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যেত। সে সময় অনেকেই কুসংস্কারে বিশ্বাস করত যে রাজার ছোঁয়ায় রোগ ভালো হয়ে যায়। তবে রাজ পরিবারের কেউ রোগীদের ছুঁতে চাইত না বলে স্বর্ণের মুদ্রা ছুঁয়ে রোগীর কাছে পাঠিয়ে দিত এবং সেই মুদ্রা ক্ষতস্থানে ছুঁয়ে দেওয়া হতো। স্বর্ণের এ মুদ্রার এক পিঠে পরি ও অন্য পিঠে নৌকার ছবি ছাপানো থাকত।

লিডেন হার্ট, ব্রিটেন: ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহর মতো বহুল প্রচলিত কার্যকলাপ থাকলেও ভালোবাসার নিদর্শনও কম নয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিকে ও ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশ কয়েদিরা অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার দিকে যাওয়ার সময় এসব মুদ্রা নিয়ে যেত। কয়েনের ওপর খোদাই করা ছিল 'আমাকে ভুলে যেও না' বা 'ফরগেট মি নট'। কয়েদিরাও কাউকে ভালোবাসে- এমন বিশ্বাস স্থাপন করতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

হার্ড টাইম টোকেন, যুক্তরাষ্ট্র: ১৮৩২ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দা চলে। সে সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা সংকট এতটাই প্রকট হয় যে অনুমোদনবিহীন মুদ্রা বাজারে চলে আসে। মুদ্রা সংকটের ফলে নতুন এ মুদ্রা এলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল বেশি এখানে। সে সময়কার শাসক এ্যান্ড্রু জ্যাকসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জনমত সৃষ্টিতেও এ মুদ্রা ব্যবহার হয়।

ফ্রেন্স ট্রেজেন্স: ফ্রান্স, ১৬শ শতকে এ ধাতব মুদ্রার প্রচলন ঘটে মূলত বিবাহ ও সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে। সাধারণত বরপক্ষ কনেপক্ষকে উপহারস্বরূপ এ মুদ্রা দিত। ধাতব এ মুদ্রার ওপর দুটি হৃদয়ের চিত্র ও হাত মেলানোর দৃশ্য ছিল। ভালোবাসা ও মিলনের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়ে আছে এ মুদ্রা।

ব্রিটিশ যুগের সোনার কয়েন : প্রাচীন সময়ের মতো না হলেও, আধুনিক ভারতে কয়েনের তুচ্ছ ব্যবহারের সাথে

নোট এবং 'প্লাস্টিকের অর্থের' ব্যবহারে নির্ভরশীল। যদিও প্রাচীন যুগ এক অন্য কাহিনি বলছে। কয়েনের ব্যবহার ছিল ব্যবসায়িক অর্থে এটি শাসক কর্তৃপক্ষের দ্বারা চূড়ান্তভাবে জারি করা এবং ব্যবহার করা হতো। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কয়েনগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ

শতাব্দীতে প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং কার্তুজ ও বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি হতো। সাম্রাজ্যগুলো সমৃদ্ধ হতে শুরু করায়, তারা সোনায় তৈরি কয়েন চালু করে। এটি ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের মাটিতে পা দেয়। ব্রিটিশ শাসনামলে যে কয়েনগুলো চালু হয় সেগুলোকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েন (EIC) যা ১৮৩৫-এর আগে চালু হয় এবং পরবর্তী অধ্যায় হলো সেই সাম্রাজ্যিক যুগ যখন ভারত সরাসরি ব্রিটিশ রাজগদির কর্তৃত্বের অধীনে শাসিত হতো।

বিভিন্ন শহরে EIC তার কলোনি তৈরি করে যেগুলো 'প্রেসিডেন্সি' নামে পরিচিত ছিল, যেমন মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি, বম্বে প্রেসিডেন্সি এবং বেঙ্গল (কোলকাতা) প্রেসিডেন্সি। EIC তার প্রতিটি প্রেসিডেন্সির জন্য আলাদা কয়েন চালু করেছিল। বম্বেতে চালু করা কয়েনগুলোর বিপরীত দিকে দাঁড়িপাল্লাসহ হৃদয়াকৃতি বস্তার চিহ্ন ছিল। এই কয়েনগুলো উৎকৃষ্ট শিল্পকলার উদাহরণ যা এই কয়েনগুলো তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৮৫৭-৫৮ সালে ব্রিটিশ-ভারতের ক্ষমতা EIC থেকে ব্রিটিশ রাজগদির হাতে পরিবর্তিত হওয়ায়, তখন তাদের শাসিত সমস্ত টেরিটোরি বা এলাকায় অভিন্ন কয়েন চালু করা হয়। এটি ছিল সাম্রাজ্যিক যুগ। রাজগদি একাধিক কয়েন চালু করেছিল যেখানে ব্রিটিশ শাসক রাজা ও রানির ছবি খোদাই করা থাকত। মূলত রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি থাকত বিপরীত দিকে। ১৮৬২ সালে মুকুট শোভিত রানি ভিক্টোরিয়ার আবক্ষ মূর্তি খোদাই করা প্রথম সোনার কয়েন আসে, যা মোহর (সোনার কয়েন) নামে পরিচিত ছিল। ১১.৬৬ গ্রাম বা ০.৯১৬৭ বিশুদ্ধতা সমেত (EIC দ্বারা চালু করা সোনার কয়েনের সদৃশ) এক 'তোলা' ওজনের কয়েনগুলো ভারতীয় ব্যবসায় বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। মোহরের মূল্য পনেরোটি রূপোর টাকার সমান। তবে তাদের কম মুদ্রাঙ্কনের কারণে, মোহর অন্যান্য ধাতুর কয়েনের সাথে দুর্লভভাবে তুলনা করা হতো।

রানির ছবির সাথে, কয়েনের ওপর শব্দে লেখা থাকত 'Queen Victoria'। ১৮৭৬ সালে এটি পরিবর্তিত হয় যখন রানি ভিক্টোরিয়া 'ভারতের সম্রাজ্ঞী' শিরোনাম নেন। তারপর থেকে কয়েনের ওপর শব্দে লেখা থাকত Victoria Empress।

রানি ভিক্টোরিয়া সমেত সোনার কয়েন এখনও বিস্তৃত পরিসরে গহনায় পেনডেন্ট হিসেবে বা নেকলেসে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে। ইন্দো-ব্রিটিশ যুগের সোনার কয়েন সবসময় ভারতীয় মুদ্রা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধরে রেখেছে।

বর্তমানে বিশ্বের বড়ো সোনার কয়েন

কয়েন সমাচার

বেণীমাধব সরকার

একটি কয়েনে পঞ্চম জর্জ ,
গান্ধী আরেকটাতে
স্মৃতির দুয়ারে জ্বলছে প্রদীপ
যেমন আঁধার রাতে।
একটি কয়েনে ভিক্টোরিয়া যে
ব্রিটিশের মহারাণী
অলিখিত শত নীতি আদর্শ
সম্মুখে আনে টানি।
আরেক কয়েনে মুঘল বাদশা
মহামতি আকবর
কালের কপোলে চুম্বন এঁকে
চলেছে নিরন্তর।
একটি কয়েনে শেখ মুজিবুর
চির উন্নত শির
যার আহ্বানে বীর বাঙালিরা
ভেঙেছিল জিঞ্জির।

জাদুর কয়েন

রমজান আলী রনি

ছোট্ট খোকা সময় পেলে
বন্ধু নিয়ে খেলে
গোপনেতে কয়েন নিয়ে
মাটির ব্যাংকে ফেলে।

চুপিচুপি বাবার কাছে
মজা খাবে বলে
একটি দুইটি কয়েন নিয়ে
ফেলে তলে-তলে।

হঠাৎ একদিন খোকার মায়ের
অসুখ হলো খুব
বাবা,দাদা টাকার জন্য
চিন্তায় মারে ডুব।

এমন দিনে খোকার কয়েন
জাদুর কয়েন হয়ে
আনন্দ আর খুশির আমেজ
আনে ঘরে বয়ে।

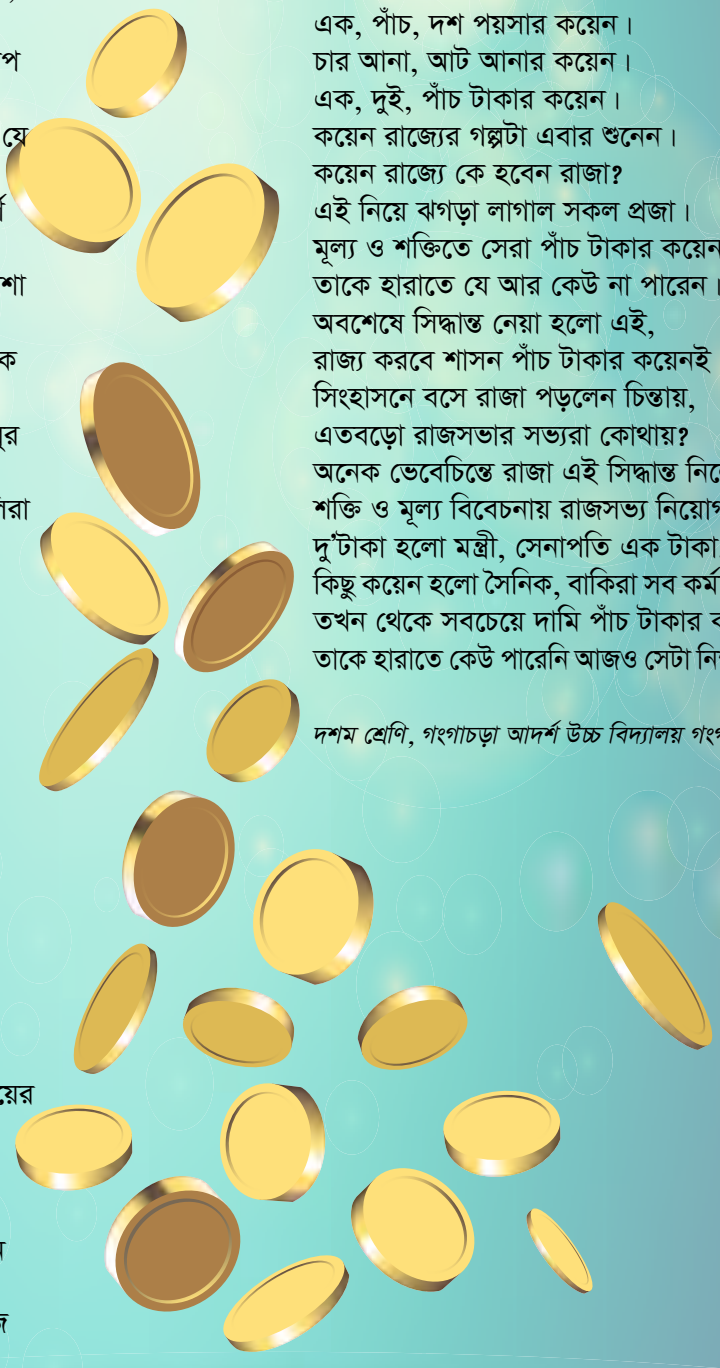

কয়েন রহস্য

জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া

কয়েন! কয়েন! কয়েন।
এক, পাঁচ, দশ পয়সার কয়েন।
চার আনা, আট আনার কয়েন।
এক, দুই, পাঁচ টাকার কয়েন।
কয়েন রাজ্যের গল্পটা এবার শুনেন।
কয়েন রাজ্যে কে হবেন রাজা?
এই নিয়ে ঝগড়া লাগাল সকল প্রজা।
মূল্য ও শক্তিতে সেরা পাঁচ টাকার কয়েন,
তাকে হারাতে যে আর কেউ না পারেন।
অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এই,
রাজ্য করবে শাসন পাঁচ টাকার কয়েনই।
সিংহাসনে বসে রাজা পড়লেন চিন্তায়,
এতবড়ো রাজসভার সভ্যরা কোথায়?
অনেক ভেবেচিন্তে রাজা এই সিদ্ধান্ত নিলেন,
শক্তি ও মূল্য বিবেচনায় রাজসভ্য নিয়োগ দিলেন।
দু'টাকা হলো মন্ত্রী, সেনাপতি এক টাকা,
কিছু কয়েন হলো সৈনিক, বাকিরা সব কর্মচারী ও প্রজা।
তখন থেকে সবচেয়ে দামি পাঁচ টাকার কয়েন,
তাকে হারাতে কেউ পারেনি আজও সেটা নিশ্চয়ই জানেন।

দশম শ্রেণি, গংগাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় গংগাচড়া, রংপুর।

আশ্চর্য কয়েন

কমলেশ রায়

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরে কয়েন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এক কিশোর। নাম তার পলু। বয়স ষোলোর কাছাকাছি। কোথাকার কয়েন এটা ? এই কয়েন তো এ দেশে চলে না। এ রকম কয়েন সে জীবনে দেখেনি।

কয়েনটা ঠিক ধাতব নয়। আবার পলিমারেরও নয়। অনেকটা ক্রিস্টালের কাছাকাছি। তবে ঠিক ক্রিস্টালেরও নয়। কিসের তৈরি কয়েন এটা ? পলু অনেক চেষ্টার পরও মোটেই বুঝতে পারে না।

অনেক ভেবে ও খুঁটিয়ে দেখে সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। যে এটা কোনো সাধারণ কয়েন নয়। এটা বিশেষ কয়েন।

হঠাৎ কয়েনটাকে ঘুরাতে ইচ্ছে করল। বাবা প্রায়ই এটা করতেন। আর পলু খুব মজা পেত। মেঝের ওপর রেখে বাম হাতের তর্জনী দিয়ে কয়েনটাকে খাঁড়া করে চেপে ধরল সে। তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্য নিয়ে তর্জনী দিয়ে হালকা করে আঘাত করল কয়েনটাকে। কয়েনটা লাটিমের মতো ঘুরতে থাকল।

পলুর আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি ছিল। কয়েনটা থেকে প্রথমে মিহি একটা শব্দ বের হলো। তারপর আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হতে শুরু করল। একটু বাদে মিহি শব্দটা স্পষ্ট হতে থাকল। শব্দটা এ রকম- সা সা সা ...। আর গা থেকে একটা আলো ঠিকরে বের হতে শুরু করল। আলোটা কেমন যেন, অনেকটা বেগুনি, বেগুনি।

হাঁ করে কয়েনটাকে দেখতে থাকল পলু। কয়েনটা ঘুরছে। গা থেকে আলো বের হচ্ছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। থামার নাম নেই। লাটিম হলে তো অনেক আগেই থেমে যেত। ঘূর্ণনের সঙ্গে আলোর উজ্জ্বলতাও যেন বাড়তে থাকল।

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে...'। নিজের অজান্তেই গুনগুন করে গাইছে পলু। তার গানের গলা ভালো। এলাকায় গায়ক হিসেবে সুনাম আছে তার। প্যান্টের পকেট থেকে সে মোবাইল ফোন বের করল। সুন্দর এই দৃশ্যটা ভিডিও করতে চাইল। তখনই ঘটল বিপত্তি। মোবাইল ফোনের সামনের কাচটা কোনো শব্দ না করেই ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না পলু। যদি কেউ দেখে বা শুনে ফেলে। বদ্ধ ঘরে থাকার পরও সে ভরসা পাচ্ছে না। ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে থামিয়ে দিল কয়েনটাকে। তবে এটাকে থামাতে গিয়ে হাতটা এতখানি ঝাঁকি খাবে সেটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কেমন অবশ-অবশ লাগছে।

কয়েনটাকে পলু খুঁজে পেয়েছে নতুন চরে। সেখানে সে গিয়েছিল তালগাছ লাগাতে। মাটি খুঁড়ে শেষ তালের আঁটিটাকে গর্তে রেখে ফের মাটি দিয়ে ভরাট করছিল । হঠাৎ ডানদিকে চোখ যেতেই দেখল একটা কিছু চকচক করছে। সে আর চোখ ফেরাতে পারল না। জিনিসটা চুম্বকের মতো টানল তাকে। কাছে গিয়ে দেখল চকচকে জিনিসটা আসলে একটা কয়েন।

দুই.

একটা ঘোর তখন পেয়ে বসেছিল পলুকে। কয়েনটা সে বার বার জামার বুক পকেটে রাখছিল, আবার বের করছিল। কিছুতেই কৌতূহল কমানো যাচ্ছিল না। কয়েনটা খুব টানছিল তাকে।

পলুর ঘোর কাটে মেঘের গর্জনে, বজ্রপাতের শব্দে। তাকিয়ে বোকা বনে গেল সে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভর দুপুরে সন্ধ্যা নেমেছে যেন।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। আজকাল বজ্রপাত বেড়েছে। প্রাণহানিও হচ্ছে খুব।

চার বছর আগে এমনি এক দুর্যোগের দিনে মা-বাবাকে হারিয়েছে পলু। মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তারা। নানির কাছে তাকে রেখে মা-বাবা শহরে যায় জরুরি কিছু কাজে। ফেরার পথে শুরু হয় ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি। বাসে করে ফিরছিল তারা। প্রবল বাতাস, তুমুল বৃষ্টি। চালক খুব সাবধানে চালাচ্ছিল। কারণ দশ হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ব্রিজে উঠার পর ঘটে দুর্ঘটনা। বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে পড়ে যায় নদীতে। মারা যায় বাইশ জন যাত্রী। বাকিরা সবাই কমবেশি আহত হয়। সেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বাসের ওপর বজ্রপাতের কারণে। পলুকে চালক বলেছে এ কথা। বেঁচে যাওয়া যাত্রীদেরও তাই মত।

সেই থেকে শুরু। রাস্তার ধারে, মাঠে, ফাঁকা অনাবাদি জায়গায় তালগাছ লাগিয়ে বেড়ায় পলু। কারণ তালগাছ বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। প্রাণহানির ঝুঁকি কমায়। এলাকার বিভিন্ন বাড়ি গিয়ে তালের আঁটি সংগ্রহ করে সে। বিনিময়ে বেশিরভাগ সময় তাকে গান শোনাতে হয়। তার গলার একটা গান সবার বিশেষ পছন্দ। 'তুমি এমনই জাল পেতেছ সংসারে...' গানটি অসম্ভব দরদ দিয়ে গায় সে। কতবার যে এই গানটি তাকে গাইতে হয়েছে।

পরিস্থিতি সুবিধার নয়। কানে আঙুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়ল পলু। বড়ো ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। কখন থামবে এই ঝড়বৃষ্টি ? অনুমান করা শক্ত। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। পায়ে সে রাবারের জুতাই পড়ে। বেশ বুঝতে পারছে, তার চুল খাঁড়া হয়ে যাচ্ছে। ত্বক শিরশির করছে। তবে কী কাছে কোথাও বজ্রপাত হবে ? তার ভয় করতে থাকল।

খুব বেশি সময় দেরি করতে হলো না। আকাশ থেকে লম্বা একটা আলোকরশ্মি ধেয়ে আসতে থাকল এদিকে। এই বিপদের হাত থেকে আজ বুঝি আর নিস্তার নেই। ঠিক তখনই ঘটল আশ্চর্য এক ঘটনা। বুক পকেটে রাখা কয়েন থেকে পালটা একটা আলোকরশ্মি ছুটে গেল সেদিকে। একশ গজ উঁচুতে থাকতেই সংঘর্ষ হলো দুই আলোকরশ্মির। তীব্র আলোর ঝলকানিতে বন্ধ হয়ে গেল পলুর চোখ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুনল কানের পর্দা ফাটার মতো শব্দ। তার আগে অবশ্য আরো একটা ঘটনা ঘটেছে। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি তখন কিছুটা পিচ্ছিল। কয়েন থেকে আলোকরশ্মি ছুটে যাওয়ার সময় বেশ জোরে ধাক্কা দিয়েছে তাকে। ফলে সে পিছনের দিকে বেশ খানিকটা দূরে পিছলে চলে যায়। প্রাণটাও এ যাত্রায় বেঁচে যায়।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো জামার পকেটের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি।

তিন.

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফিরছেন পিয়াস। তিনি পলুর মামা। চিরকুমার, খ্যাপাটে একজন মানুষ। তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি একজন গায়ক। পালাগান গেয়ে বেড়ান।

মা-বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে পলু মামাবাড়িতেই থাকে। সংসারে আগে মানুষ ছিল তিনজন। দুই বছর আগে নানি মারা যাওয়ার পর এখন মাত্র দুজন। মামা আর ভাগনে।

পিয়াস মাঝেমধ্যেই সুর করে গান : 'মামা-ভাগনে যেখানে বিপদ নেই সেখানে।' তার এক কাঁধে দোতারা আরেক কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। জঙ্গলের ওপারে তিন গ্রাম পর সুখীপুর। সেই গ্রামেই গতকাল রাতে পালাগান ছিল। আসর বেশ জমে গিয়েছিল। চলে প্রায় সারারাত। ভোরে গেছেন ঘুমাতে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছেন। তারপর উঠে পড়েছেন। বাথরুম, গোসল সেরে করেছেন নাশতা। এরপর যখন পাওনা হাতে পেয়েছেন তখন ঘড়িতে এগারোটার বেশি বাজে। বাজানদারদেরকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তখন সাড়ে এগারোটা পেরিয়েছে।

দূর তো কম নয়। তিনটে গ্রাম পর জঙ্গল। জঙ্গলও তো বেশ বড়ো। ঘন, গভীর। তারপর ফাঁকা মাঠ। সেটা পার হলে তবেই তার গ্রাম। নাম দীঘলদিয়া।

জঙ্গলে পৌঁছাতেই দুপুর হয়ে গেল। ঘন গাছপালা। দিনের বেলায়ও কেমন অন্ধকার ভাব। আজ কী অন্ধকার একটু বেশি ? তাই তো মনে হচ্ছে। তবে কী মেঘ করেছে ? গাছপালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন পিয়াস। হ্যাঁ, আকাশ কালো হয়ে আছে। ঝড় আসছে।

জোরে পা চালালেন তিনি। বুঝলেন লাভ নেই। ঝড়-বৃষ্টি আসার আগে কোনোভাবেই গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তারপরও গতি কমালেন না। যতটুকু সামনে যাওয়া যায় ততটুকুই লাভ। বৃষ্টি-কাদায় পথ বড়ো পিচ্ছিল হয়ে যায়।

ঘন অন্ধকার। মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়ো বাতাস বইছে।

বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের অনেক বেগ। গাছের ডালপালাকে ইচ্ছেমতো ঝাঁকাচ্ছে। ভেঙে ফেলতে পারলেই যেন শান্তি। আকাশ জুড়ে আলোর ঝলকানি। কী সর্বনেশে গর্জন। এ যেন শুধু বজ্রপাত নয়, আকাশ থেকে কেউ একের পর এক শক্তিশালী কামান দাগাচ্ছে।

পলুর কথা মনে পড়ল। সে বলেছে, এ সময় গাছের নিচে দাঁড়াতে হয় না। ফাঁকা জায়গায় গিয়ে নিচু হয়ে বসতে হয়। ওই তো ফাঁকা জায়গা। পিয়াস এগিয়ে গেলেন। ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসার সুযোগ পেলেন না তিনি। তীব্র আলোর ঝলকানিতে ঝলসে গেল তার দেহের বেশিরভাগটা।

একদল যেন জানত এমনটি ঘটবে। তারা তৈরিই ছিল। পিয়াসের দেহটাকে তারা দ্রুত মহাকাশযানে নিয়ে গেল। স্বচ্ছ বড়ো বাথটাবের মতো একটা কিছুতে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা দ্রবণে দেহটা ডুবিয়ে দেওয়া হলো। মাথাটাকে ঝটপট টেনে নিল একটা স্বয়ংক্রিয় হেলমেট। মস্তিষ্কের নিউরণগুলোকে যাচাই বাছাই করতে শুরু করল। স্মৃতিগুলো জমা হতে থাকল একের পর এক।

চার.

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। মামা এখনো ফিরলেন না কেন ? দুশ্চিন্তা হতে থাকে পলুর। মামার তো বিকালের মধ্যে ফিরে আসার কথা। এদিকে তার মোবাইল ফোনটাও বন্ধ। তবে কী অন্য কোথাও নতুন বায়নায় গেছেন? এ রকম হলে তো মামা ফোন করে জানিয়ে দেন।

একটা ডায়েরিতে সাধারণত আয়োজকদের নম্বর লিখে রাখেন মামা। মজা করে তিনি এটাকে বলেন হিসাবের খাতা। পলু ডায়েরিতে লেখা একদম শেষের নম্বরে ফোন করল। ওপাশ থেকে বলা হলো : উনি তো সাড়ে এগারোটার দিকে এখান থেকে চলে গেছেন।

দুশ্চিন্তার সঙ্গে একটা ভয়ও যোগ হলো। বড়ো কোনো অঘটন ঘটেনি তো ? যা বজ্রপাত হলো আজ! পলু নিজেও তো অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

রাত গভীর হলেও পলুর ঘুম এল না। মামার যদি কিছু হয়ে যায়। মামা ছাড়া তার তো আর কাছের কেউ নেই। সারারাত তার ঘুম হলো না বললেই চলে।

সকালে সে থানায় গেল। খুলে বলল সব। ডায়েরি করল।

আজ আর স্কুলে যাওয়া হবে না। সপ্তাহের প্রথম দিনই কামাই যাবে। যাক। কিছুই ভালো লাগছে না তার। মামার জন্য তার মন খারাপ।

ফেরার পথে হঠাৎ দেখল একটা জটলা। একটা মেয়ে চেঁচাচ্ছে। সে এগিয়ে গেল। মেয়েটি তো তাদের ক্লাসের এশা। স্কুলে যাচ্ছিল। তাকে ঘিরে রেখেছে চেয়ারম্যানের বখাটে ছেলে রাফি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। উত্যক্ত করছে।

মন তো খারাপ ছিলই, এবার মেজাজও খারাপ হলো। কী হচ্ছে এসব ? জোর গলায় বলল পলু।

ওরে বাবা, গলায় কী জোর। হবেই তো, ছেলে এখন ক্লাস টেনে পড়ে। রাফি বিরক্ত হয়ে এগিয়ে এল। আরো বলল, ধমকে কোনো লাভ হবে না। তুমি বরং কেটে পড়ো।

ওকে স্কুলে যেতে দিন। পলু চোখে চোখ রেখে বলল।

তোর তো দেখি বড্ড বাড় বেড়েছে। কোমর থেকে পিস্তল বের করল রাফি। বুকের কাছটায় তাক করে বলল, এবার কেটে পড়বি তো।

কেন যেন মোটেও ভয় পেল না পলু। বলল, কিছুতেই যাব না। আপনারাই বরং চলে যান। আর কোনো দিন এই খারাপ কাজ করবেন না।

তবে রে...। রাফি লাফিয়ে উঠে পলুর বুক বরাবর লাথি দিলো। ছিটকে পড়ে গেল পলু। সাঙ্গপাঙ্গরা খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসছে।

হঠাৎ ককিয়ে উঠল রাফি। কী হলো এটা ! তার ডান পায়ে যেন বিদ্যুতের ঝটকা লেগেছে। পলু পাশে পড়ে থাকা একটা ইটের টুকরো তুলে নিয়ে ঢিল ছুঁড়ল। অব্যর্থ নিশানা। রাফির কপালে গিয়ে আঘাত হানল। খ্যাপে গেল সে। ডান পা তুলতে পারছে না। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। পিস্তল তাক করল রাফি। পড়ে যাওয়া পলুর বুক বরাবর। ট্রিগারে টান দেবে এখনই। দেখা যাক ওর কত সাহস। তখনই অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটল। পলুর বুক পকেট থেকে একটা আলোকরশ্মি ধেয়ে এল। ছিটকে পড়ল রাফির হাতের পিস্তল। তার ডান হাতও অবশ হয়ে এল। ধপাস করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল তার দেহটা। সাঙ্গপাঙ্গরা এ ঘটনায় ভড়কে গেল। যে যার মতো পালালো তারা।

এশারও চোখ বড়ো হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পলুর দিকে। পলু উঠে দাঁড়িয়ে এশার কাছে গিয়ে বলল, যাও। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রাফি তখনও পড়ে আছে। কাতরাচ্ছে।

পাঁচ.

জগু ওস্তাদ কিসিমের মানুষ। পেশায় চোর। চুরিটাকে সে শিল্প পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সবাই সেই কথা জানে, অথচ ধরতে পারে না, কিছু বলতেও পারে না। আজ পর্যন্ত কেউই তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি। প্রতিটি কাজ সে সময় নিয়ে বুঝেশুনে নিখুঁতভাবে করে।

গ্রামে চাউর হয়ে গেছে পিয়াস বয়াতি নাকি বজ্রপাতে মারা গেছে। তবে তার লাশের হদিস মেলেনি। তার মানে পলু একা বাড়িতে। সারাদিন দুশ্চিন্তার পাশাপাশি যথেষ্ট ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে। এতক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাওয়ার কথা। এটাই মোক্ষম সুযোগ।

জগু চুপ করে বসে আছে। পিয়াস বয়াতির বাড়ির পেছনের দিকটায়। অনেক গাছপালার ফাঁক গলে হিমেল বাতাস এসে লাগছে তার গায়ে। এখন মধ্যরাত। আরেকটু পরেই সে অভিযানে নামবে।

চোর হলেও জগু কিছু নিয়ম মেনে চলে। সে কোনো সদ্য মৃতের বাড়িতে চুরি করে না। তিন রাত পেরুনোর আগে কোনোভাবেই নয়। আজ কী তাহলে সে নিয়ম ভাঙছে ? মনে মনে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছে সে। বয়াতি মারা গেছে এমন নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়নি। সবাই সেটা অনুমান করছে মাত্র। তবে তার প্রলুব্ধ হওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ আছে। বিকালে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে আলোচনা করতে শুনেছে সে। বখাটে ছেলেগুলো চাপা গলায় ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল। সে তখন চায়ের দোকানের বাইরে মোটা গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা তাকে দেখতে পায়নি। তবে তাদের কথা সে দিব্যি শুনতে পেয়েছে। কারণ তার কান বড়ো খাঁড়া। তা কী আছে পলুর বুক পকেটে ? যেখান থেকে অমন আলো বের হয়। নিশ্চয়ই দামি কোনো জিনিস। একবার বাগাতে পারলে হয়। বেচে বেশ কিছু দিন বসে আয়েশ করে খাওয়া যাবে। কথাটা পাঁচ কান হওয়ার আগেই তাই হাজির হয়েছে সে।

একটা ধাতব তার ঢুকিয়ে বিশেষ কৌশলে দরজা খুলল জগু। হ্যাঁ, পলু খাটে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর সেই জামাটা কোথায় ? জিনিসটা কী এখনো জামার

পকেটে আছে? জগু অন্ধকারেই খানিকক্ষণ খুঁজল। সুবিধা করতে পারল না। কোমরে গুঁজে রাখা মিনি টর্চলাইট বের করল সে। বোতামে সতর্কভাবে চাপ দিলো। সুক্ষ্ম একটা আলোকরেখা বের হলো। তখনই পলুর পড়ার টেবিল থেকে এক চোখ ধাঁধানো তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি ধেয়ে এল। জগুর হাত থেকে ছিটকে পড়ল টর্চ। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে আঁতকে ওঠার শব্দ বের হলো। পলুর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, কে, কে ওখানে ?

ডানহাতটা যেন অবশ হয়ে গেছে। বাম হাত দিয়ে পড়ে যাওয়া টর্চটাকে কোনোমতে তুলে নিয়ে দৌড়ে পালালো জগু।

পলু কয়েনটাকে বুদ্ধি করে বইয়ের ভাঁজে রেখেছিল। খাট থেকে নেমে গিয়ে দেখল, কয়েনটা জায়গা মতোই আছে।

জগু এক দৌড়ে কবরখানার পাশের হিজল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো। হাঁপাচ্ছে সে। এ দিকটায় দিনের বেলাতেও মানুষজন খুব একটা আসে না।

কী জগু ভাইয়া নাকি ? বয়াতির গলা।

চমকে গেল জগু। জি-ই-ই...। তার গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আমার বাড়িতে গিয়েছিলে বুঝি। তা তেমন কিছু পেলে? বয়াতি হেসে বললেন।

জবাবে কী বলবে জগু। তার এখন দৌড় দেওয়া উচিত। কিন্তু পায়ে যেন কোনো শক্তি নেই। মাথা ঘুরছে। নাহ্, সদ্য মৃতের বাড়িতে যাওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি। লোভে পাপ। পাপে পতন। তার মাথাটা ঘুরছে। দেহে ভারসাম্য রাখতে পারছে না সে।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল জগু।

ছয়.

পরের দিন নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকেই বের হলো না পলু। বিকালে এশা এসেছিল তার মাকে নিয়ে। উনি পলুর মাথায় হাত বুলিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। খাবারও এনেছেন সঙ্গে করে। রেখে গেছেন পড়ার টেবিলের ওপর। রাতে খেয়ে নিতে বলেছেন। এশা মুখে তেমন কিছুই বলেনি। কেবল বার বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। মায়ায় ভরা ছিল সেই তাকানো। শুধু যাওয়ার আগে এশা বলল, সাবধানে থেকো। ওরা কিন্তু খুবই খারাপ।

পলু ম্লান হেসে বলল, জানি।

গত রাতে কে এসেছিল তার ঘরে ? চোর নাকি অন্য কেউ? এরপর রাতে আর ঘুম হয়নি। তবে দিনে অনেকটা সময় ঘুমিয়ে নিয়েছে। আজ রাতে পারতপক্ষে সে ঘুমাবে না বলে ঠিক করেছে।

পলু খাটে বসে আছে। অনেক রাত। নানা চিন্তা ভর করছে তার মাথায়। মামা কী আসলেই আর ফিরবেন না ? তার চলবে কী করে ? লেখাপড়ার কী হবে ? কয়েনটাকে সে আগলে রাখবে কী করে ?

বাড়ির বাইরে তখন জড়ো হয়েছে রাফির সাঙ্গপাঙ্গরা। মোট ছয়জন। সে নিজে আসতে পারেনি। তাই তাদের পাঠিয়েছে। বাড়িতে ঢোকার মুখেই থামতে হলো তাদের। পিয়াস বয়াতি দাঁড়িয়ে। বললেন, কী চাও তোমরা ?

কিছু না। আপনি না মারা গেছেন ? চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বখাটে দলের অন্যতম শিরোমণি সমু। দলে রাফির পরই তার স্থান।

হ্যাঁ, মারা গেছি। তারপরও ইচ্ছে হলো তোমাদের একটু দেখে যাই। ঠান্ডা গলায় বললেন পিয়াস বয়াতি। তার এ কথার ফল হলো মারাত্মক।

সমুসহ সবাই ঝেড়ে দৌড় দিল।

বাইরে কারা কথা বলছে ? মামার গলা শোনা গেল মনে হয়। নাকি এটা তার মনের ভুল ? তন্দ্রার মতো এসেছিল কী ?

পলু কান খাঁড়া করে অপেক্ষা করতে থাকল। দেখি মামা সত্যি আসেন কিনা।

সাত.

সকালে পলু থানায় গিয়েছিল। না, তারা এখনো মামার কোনো খোঁজ পাননি। ফেরার পথে একটা জিনিস সে খেয়াল করল, লোকজন কেমন করে যেন তার দিকে তাকাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে অনেকবার সে মামার মোবাইলে ফোন করার চেষ্টা করল। ফোন বন্ধ।

সন্ধ্যার পরই তার কেমন যেন গা ছমছম করতে থাকল। মনে হলো আজকের রাতটা কঠিন রাত। বিপদের গন্ধ পেল সে। তাকে সতর্ক হতে হবে।

রাত এগারোটার পর খোদ চেয়ারম্যান সাহেব তার

দুই বডিগার্ডসহ হাজির। উঠানে পা রাখতেই দেখলেন পিয়াস বয়াতি পায়চারি করছেন।

বয়াতি কী আজকাল রাতে রাতে বাড়ি ফিরো নাকি। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন।

ফিরতে তো চাই না। কিন্তু না ফিরে পারি না। বাধ্য হয়েই তাই ফিরতে হয়। পিয়াস বয়াতি বললেন।

রাখো তোমার ভাবের কথা। চেয়ারম্যান বিদ্রুপ করে বললেন। তারপর বডিগার্ড দুজনের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিলেন, খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন ? ঘরে ঢুকে পলুকে বের করে আনো। হারামজাদার সাহস কত, আমার ছেলের গায়ে হাত দেয়।

নির্দেশ শুনে বডিগার্ড দুজন ঘরের দিকে দৌড়ে যায়। এই ফাঁকে চেয়ারম্যান একটু রসিক হতে চেষ্টা করেন। পিয়াস বয়াতির দিকে তাকিয়ে বলেন, চেহারায় তো বেশ একটা আলগা জেল্লা এনেছ।

আপনার মতো এ রকম ভুঁড়ি আর বানাতে পারলাম কই ? বয়াতিও রসিকতা করলেন।

রোজ বিরিয়ানি না খেলে এমন ভুঁড়ি বানানো যায় না, বুঝলে।

চেয়ারম্যান হাতের লাঠি দিয়ে বয়াতির পেটে খোঁচা দিতে গেলেন। কিন্তু এ কী ! লাঠি সহজেই শরীরের এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। চেয়ারম্যান আঁতকে উঠে বললেন, তুমি তাহলে সত্যি মারা গেছো বয়াতি ?

হ্যাঁ, গেছি। তবে যতবার আপনি আর আপনার ছেলে আমার ভাগনে পলুর ক্ষতি করতে আসবেন আমি ঠিক হাজির হয়ে যাব।

বলো কী। চেয়ারম্যান সাহেবের মুখ দিয়ে আর কিছু বের হলো না। তার আগেই ধপাস করে তার দশাসই দেহটা মাটিতে পড়ে গেল।

ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে পলু নেই। দৌড়ে বের হয়ে আসলো দুই বডিগার্ড। এসে দেখে চেয়ারম্যান মাটিতে পড়ে আছে। কীভাবে হলো ? দুজনেই প্রশ্ন করল প্রায় একসঙ্গে।

আমি করেছি। হালকা হেসে বললেন পিয়াস বয়াতি।

কী তোমার এত সাহস। কোমর থেকে অস্ত্র হাতে নিয়ে তেড়ে গেল দুই বডিগার্ড। আঘাত করতে চাইল

বয়াতিকে। কিন্তু মোটেই লাভ হলো না। বয়াতির শরীর ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভড়কে গেল তারা।

আমি বেঁচে থাকলে তো আমাকে ধরবে। বয়াতি এবার জোরে হাসতে থাকলেন।

একজন বডিগার্ড ভোঁ-দৌড় দিলো। আরেকজন মাথা ঘুরে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল।

আট

পলু রান্নাঘরে লুকিয়েছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব। এবার সে দৌড়ে বাইরে এল। মামাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। পারল না। ভড়কে গেল সেও।

ভয় পেয়ো না। আপাতত চলো। এখন এখানে থাকা তোমার জন্য ঠিক হবে না। মামা বললেন।

পলু কেন যেন একটুও ঘাবড়ালো না। সে মামার পিছু হাঁটা শুরু করল।

জোছনা রাত। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছে দুজন। পিয়াস বয়াতি আর পলু। তারা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে।

মামা, আমি আপনাকে ছুঁতে পারছি না কেন ?

কারণ আমার তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, পাচ্ছো।

এটা কীভাবে সম্ভব ?

সম্ভব। এটা হলো হলোগ্রাফি।

হলোগ্রাফি কী মামা ?

হলোগ্রাফি হলো ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির একটা বিশেষ প্রক্রিয়া।

তারমানে আপনি আর বেঁচে নেই ?

না, নেই। বজ্রপাতে মারা গেছি।

আপনার দেহটা কোথায় ?

আছে। ঠিকমতো আছে।

পাওয়া যাবে না ?

যাবে, সেজন্যই তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায়? জঙ্গলে ?

হ্যাঁ। ওখানে গিয়ে তুমি কয়েনটা ওদেরকে ফেরত দিয়ে দেবে।

কাদের ফেরত দিয়ে দেবো ?

যাদের কয়েন তাদেরকে।

তারা কারা ?

দূর এক জগত থেকে এসেছে তারা। কয়েনটা নিয়ে আবার ফিরে যাবে।

আমি কী তাদের দেখতে পাবো ?

না, পাবে না। ওরা দেখা দিতে আগ্রহী নয়। তবে আমার দেহটা ওরা তোমাকে ফেরত দেবে।

আপনাকে ছাড়া থাকতে আমার খুব কষ্ট হবে।

জানি, তারপরও কিছু করার নেই। এটা হলো রূঢ় বাস্তবতা।

আমার বোধহয় আর লেখাপড়া করাটা হবে না।

হবে, অবশ্যই হবে।

কীভাবে হবে ?

আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। দোতারা রাখার জায়গাটায় দেখবে ছোট্ট একটা লাল কাপড়ের ব্যাগ। তার মধ্যে ট্রাংকের চাবি আছে। ট্রাংকে বেশ কিছু টাকা আছে। ব্যাংকে টাকা রাখা আছে। তাতে তোমার চলে যাবে। ব্যাংকের কাগজপত্রও ট্রাংকে রাখা আছে। তুমি শুধু মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। করবে তো ?

আচ্ছা, করব।

পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তালগাছ কিন্তু লাগাবে। ওটা বন্ধ করো না।

ঠিক আছে। তালগাছ লাগানো বন্ধ করব না।

এভাবে কথা বলতে বলতে এক সময় তারা জঙ্গলের কাছে চলে আসে। জঙ্গলে ঢুকে বেশ খানিকটা পথ হাঁটে তারা। মামা মানে পিয়াস বয়াতি বললেন, এবার তুমি থামো পলু।

পলু থামে। মামার দিকে তাকায়।

কয়েনটা সামনের মাটিতে রেখে দাও। মামা বলার পর পলু তাই করল।

এখন তোমাকে জঙ্গলের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। পারবে না ? মামা জিজ্ঞেস করলেন।

পারব মামা। আমাকে পারতেই হবে।

জানি তুমি পারবে। তাহলে রওনা দাও। ভোরেই তুমি জঙ্গলের বাইরে আমার দেহটাকে দেখতে পাবে।

যাই মামা।

হ্যাঁ, তাহলে আসো।

পলু পা বাড়ায় সামনের দিকে। হঠাৎই তার বুকটা

ফাঁকা মনে হয়।

পেছন থেকে ভেসে আসে মামার গলা : ভালো থেকো পল্লব। প্রিয় ভাগনে আমার।

মামা যখন তাকে বেশি আদর করে ডাকেন তখন এই নামে ডাকেন। পলুর দুচোখ জলে ভরে এল। কিন্তু সে একবারের জন্যও পেছনে ফিরে তাকাল না। কারণ কে জানে তার মামা হয়ত আর ওখানে নেই।

ভোর হয়েছে। এতক্ষণ একটা গাছতলায় বসে কাঁদছিল সে। পাখি ডাকছে। চারপাশ ফরসা হয়ে উঠছে। পলু জঙ্গলের বাইরের দিকটা ধরে হাঁটা ধরল। একটু সামনের দিকে যেতেই দেখল মামার নিথর দেহ পড়ে আছে।

ভেবেছিল আরো বেশি করে কান্না পাবে। কিন্তু না, তার মাথায় হঠাৎ করে একটা চিন্তা চেপে বসল। কী করে এই মরদেহ গ্রামে নিয়ে যাবে সে।

একটু ভাবল। সময় নিয়ে ভাবল সে। সূর্য বেশ খানিকটা উঠার পর ওসিকে ফোন দিলো। বলল, মামার মরদেহ পাওয়া গেছে।

ওসি সাহেব পলুকে অনেক স্নেহ করেন। মামাকেও পছন্দ করতেন খুব। সব শুনে তিনি বললেন, তুমি চিন্তা করো না। আমি আসছি।

নয়.

বৈঠক চলছে। জরুরি বৈঠক। অংশগ্রহণকারী সবাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। বৈঠকে উপস্থিতি শতভাগ। বত্রিশ সদস্যের মধ্যে হাজির বত্রিশই। সূচনা পর্বে শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। এটা কেবলই সৌজন্যতা। করার জন্যই করা। এরপর সভাপতি ঘোষণা করল : এখন একটা তথ্যচিত্র দেখানো হবে। যেটাকে ঘিরেই আজকের আলোচনা।

ব্যতিক্রমী এই ঘোষণায় উপস্থিত সবাই একটু অবাক হলো বৈকি।

তথ্যচিত্র দেখানো হলো। সবাই নির্মাতার প্রশংসা করল। কী দারুণ ভাবনা। বিষয়বস্তু বাছাইয়ে কী নিপুণ সক্ষমতা। একেবারে সময়োপযোগী একটা চিত্রায়ণ। সবুজ একটা বদ্বীপের সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যচিত্রটির আলোচনা করল বিজ্ঞ সমালোচকরা। বেশিরভাগই পঞ্চমুখ হলো প্রশংসায়। মানুষকে নিয়ে এ ধরনের তথ্যচিত্র আরো বেশি করে বানানো উচিত বলে মন্তব্য করল অনেকে।

পুরোটা সময় তথ্যচিত্রের নির্মাতা ঝিম মেরে বসে থাকল। প্রশংসা উপভোগ করল তাকিয়ে তাকিয়ে। তবে তার মুখে সারাক্ষণ মিটিমিটি একটা হাসি লেপটে রইল।

সবশেষে এবার সভাপতির বক্তব্যের পালা। একটু কেশে নিয়ে ভারিক্কি গলায় বক্তব্য শুরু করল সভাপতি।

'আমরা সবাই জানি আমাদের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা এআই-৭। তাকে আমিই বলেছিলাম এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করতে। প্রায় সবার প্রশংসা বাক্য শুনতে ভালোই লাগল। গুণী এই নির্মাতার শ্রম তাহলে অনেকাংশে স্বার্থক। কিন্তু একটা বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আর সেটা হলো, আমরা সবাই আত্মতুষ্টিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েছি। তথ্যচিত্রের সবকিছুই সুন্দর, প্রশংসাযোগ্য, ঠিক আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু কয়েকটা বিষয় সবার নজর এড়িয়ে গেল কী করে? কিশোর ছেলেটা যে কয়েনটা পেয়েছিল সেটা কার বা কাদের? এটা তো সাধারণ কোনো কয়েন নয়। পৃথিবীতে এ ধরনের কয়েনের তো প্রচলন নেই। তাহলে কারা সেটা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে গেল? মহাকাশযানটা কোথা থেকে এসেছিল? নিজস্ব স্যাটেলাইট থেকে এই ফুটেজগুলো পেতে এক সপ্তাহ দেরি হলো কেন? আমাদের নিরাপত্তা পদ্ধতিতে এতটা শিথিলতা কবে থেকে শুরু হলো?'

বৈঠকের পরিবেশ হঠাৎই অন্যরকম হয়ে গেল। সভাপতির বক্তব্যে সবাই নড়েচড়ে বসল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কেউ মাথা নিচু করে ফেলল। কেবল তথ্যচিত্রের নির্মাতা তখনও মিটিমিটি হাসছে।

সভাপতির মুখমণ্ডলে চাপা ক্রোধের আঁচ ছড়িয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সেটা আড়াল করা যাচ্ছে না। অথচ মাথা ঠান্ডা রাখার ব্যাপারে তার আলাদা সুনাম আছে। একটু থেমে আবহটা বুঝে নেওয়ার পর আবার শুরু হলো সভাপতির বক্তব্য।

'সবার বুঝা উচিত ছিল, এটা চলচ্চিত্র নয়, তথ্যচিত্র। এইটুকু বোধগম্যও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আসলে আমরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি। ধরাকে হাতে পেয়ে সবকিছুকেই সরা জ্ঞান করছি। মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে বশে এনেছি, পৃথিবীর দখল এখন আমাদের হাতে, ঠিক আছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই

মহাবিশ্বে আরো বুদ্ধিমানরা রয়েছে। তাদের অনেকের তুলনায় আমাদের বুদ্ধিমত্তা হয়ত একেবারেই নগণ্য। আমরা আমাদের উত্তরণ ঘটাচ্ছি না। আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। এই তথ্যচিত্র কী আমাদের জন্য একটা চপেটাঘাত নয় ? কে জানে, এভাবে চলতে থাকলে একদিন হয়ত আমরা আবার মানুষের অধীনে চলে যাব। এরই মধ্যে আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি কিনা, সেটা নিয়েই তো এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে। নইলে মহাকাশযানে যারা এসেছিল, তাদের তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা। তারা কেন সেটা করল না? তারা কী মানুষকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে? মানুষকে কী তারা উন্নত কোনো বুদ্ধির খোঁজ দিয়ে গেল? এখানে উপস্থিত সবাই আমাদের সম্প্রদায়ের শীর্ষ পর্যায়ের সম্মানিত সদস্য। ভাবো, প্রিয় সদস্যরা, ভাবো। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সবাই মস্তিষ্ককে সচল করো। জেগে ওঠো। দয়া করে জেগে ওঠো। বাকি সবাইকেও জাগিয়ে তোলো। তোমাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা এভাবে বৈঠক করতে সক্ষম হবো। আমাদের সেই সামর্থও বজায় থাকবে। আজকের মতো এই বৈঠক শেষ। শিগগিরই আমরা আবার বসব। বসতেই হবে। বিদায়।'

সভাকক্ষে পিনপতন নীরবতা। সভাপতির বক্তব্য শেষ। হাততালি নেই। সবাই হতভম্ব হয়ে বসে আছে। বসে আছে তো বসেই আছে। আসন ছেড়ে উঠতেও যেন সবাই ভুলে গেছে।

দশ.

দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটা হাত। হাতে সাতটা আঙুল। সাত আঙুলে সাতটা কয়েন। মসৃণ মেঝেতে কয়েনগুলো খাড়া করে রেখে সাত আঙুল দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে। বাম হাত ব্যস্ত এই কাজে। ডান হাত কাজ শুরু করার অপেক্ষায়। অনেকদিন সংগীতের সাগরে ডুব দেওয়া হয় না। আজ বড়ো আনন্দের দিন। খুশির দিন। এমন মুহূর্ত উদযাপনে সংগীত না হলে চলে ? কিছুতেই না।

দূরদূরান্তের সাত সৌরজগতে পাঠানো হয়েছিল আলাদা মহাকাশযান। প্রতিটি দলকে দেওয়া হয়েছিল একটা করে কয়েন। প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন সাতটি গ্রহে অবতরণ করেছিল তারা। কয়েনগুলোকে ইচ্ছে করেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল বিরূপ ও প্রতিকূল পরিবেশে। পরীক্ষা করে দেখতে যে কয়েনগুলো স্বাভাবিক ও অক্ষত থাকে কিনা। এদের গুণাবলি কতটুকু অটুট থাকে। খুব দুশ্চিন্তা কাজ করছিল ভেতরে। পরীক্ষা সর্বত্র ও সর্বাঙ্গীনভাবে সফল হয়েছে। সাত মহাকাশযানই ফেরত এসেছে শুভ বার্তা নিয়ে।

কয়েনগুলো কী শুধুই কয়েন ? মোটেই না। এগুলো বিশেষ কয়েন। তথ্যপ্রযুক্তিতে ঠাসা। সভ্যতা ও ইতিহাসের দলিল। জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধারণা করা হচ্ছে, কোনোদিনই শত প্রতিকূলতায়ও এগুলো নষ্ট হবে না। মহাবিশ্ব যতদিন থাকবে কয়েনগুলো ততদিন থাকবে। এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে।

ডান হাত সচল হলো। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে বিশেষ কায়দায় ধাক্কা দেওয়া হলো একটা কয়েনকে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো-সা। কয়েনটি ঘুরতে শুরু করল। মিহি থেকে ক্রমেই শব্দ জোরালো হতে থাকল। সা, সা, সা ...। ঠিকরে বের হতে থাকল বর্ণিল বেগুনি আলো। এরপর তর্জনী আঘাত করল আরেকটা কয়েনকে। মুখ থেকে শব্দ বের হলো-রে। ঘুরতে শুরু করল কয়েনটি। আরেকটা স্বর ক্রমেই জোরালো হলো। রে, রে, রে...। সঙ্গে বর্ণিল নীল আলো। এভাবেই পরপর বাকি পাঁচটা কয়েনকে ধাক্কা দিলো তর্জনী। মুখ থেকে যথাক্রমে উচ্চারিত হলো গা, মা, পা, ধা, নি। পাঁচটি স্বরও পর্যায়ক্রমে যুক্ত হলো। গা, গা, গা...। মা, মা, মা...। পা,পা, পা,...। ধা, ধা, ধা...। নি, নি, নি...। সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ঠিকরে বের হলো বর্ণিল আরো আলো। আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এক দিকে সুমধুর সপ্তসুর। আরেক দিকে বর্ণিল বেনীআসহকলার খেলা। তাদের বিন্যাস-সমাবেশে অপার্থিব এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। সুরের মাদকতায়, সংগীতের আবহে ডুবে গেলেন তিনি। আলোয় আলোয় ভরে গেল তাঁর চারপাশ।

কয়েন ঘুরছে। কয়েনগুলো ঘুরছে। ঘুরছে...।

এগারো.

সাতটা কয়েন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা সেট। বিশেষ কায়দায় সেগুলো সাজানো হয়েছে। প্রথমে একটি, তার উপরে দুটি, একদম শীর্ষে চারটি। তিনটি তলে কয়েনগুলো এমন শৈল্পিকভাবে সাজানো হয়েছে দেখলে মনে হয় একটি লাটিম। অথচ প্রতিটি তলে প্রতিটি কয়েন আলাদাভাবে ঘুরতে সক্ষম।

সাত সেট কয়েন সামনে রাখা। অবিকল সাতটা

লাটিম। পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিস্তৃত মসৃণ তলে, ঘুরতে শুরু করবে একটু বাদে। আরো সঠিক করে বললে, ঘুরতে প্রস্তুত হয়ে আছে উনপঞ্চাশটা কয়েন।

নয় আঙুলওয়ালা আরো দীর্ঘ, আরো প্রশস্ত একটা হাত তৎপর। দুই আঙুলে রিমোট ধরে আছেন। হাতের বাকি সাত আঙুল রিমোটের সাত বোতামে।

প্রথম বোতাম টিপলেন। প্রথম লাটিম ঘুরতে শুরু করল। সম্মিলিত স্বর বের হলো। সা...। দ্বিতীয় বোতাম টিপতেই বের হলো সম্মিলিত রে...। একে একে সম্মিলিত গা..., মা..., পা..., ধা..., নি...। ঠিকরে বের হলো সম্মিলিত বর্ণময় বেনীআসহকলা।

এখানেই শেষ নয়। আলোগুলো মিলেমিশে তৈরি করল ত্রিমাত্রিক এক অবয়ব। সামনে যেন জলজ্যান্ত একজন নৃত্যশিল্পী।

বিন্যাসের আরো সুক্ষ্ম বিন্যাস। সমাবেশের মাঝে আরো অপূর্ব সমাবেশ। মোহনীয় সুর, মন ভোলানো সংগীত। চোখ ধাঁধানো আলোকছটা। মনোমুগ্ধকর নৃত্যশৈলী। ঘোর লাগা মায়াময় এক পরিবেশ। কল্পনার বাইরে, অপার্থিবের চেয়েও অপার্থিব।

স্মিত হাসিমুখে উনি নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করছেন সবকিছু।

বারো.

এ যেন অমোঘ সমীকরণ।

মহাবিশ্বে জাল ফেলে বসে আছেন মহাক্ষমতাধররা। আপন মনে খেলছেন কয়েন নিয়ে।

যার হাতে যত কয়েন, তার তত ক্ষমতা। তার তত দাপট। তার তত বুদ্ধি। বশীভূত করার শক্তিও তার তত প্রবল। উপভোগের ক্ষমতাও তার তত বেশি।

একজন, শুধু একজন মিটিমিটি হাসছেন। সবকিছু দেখছেন, আর তাল মিলিয়ে হাসছেন। বড়ো রহস্য লুকানো সেই হাসিতে।

কারণ তিনিই এই মহাবিশ্বে সবচেয়ে ক্ষমতাধর। মহা-মহাক্ষমতাধররাও তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। সব জালের সর্বশেষ দড়ি তাঁর হাতে। খানিকটা করে দড়ি ছেড়ে দিয়ে খেলা দেখছেন তিনি। আর নিজের মতো করে মজা লুটছেন।

কত কয়েন যে 'তাঁর' হাতে কে জানে। হয়ত অগণন...।

নোটের চেয়ে কয়েন ভালো

তাশদীদ বীন সিফাত

দাদুর ছিল খুতি ভরা
পাঁচশ টাকার নোটে
সকালবেলা দেখল দাদু
নোট ইদুঁরের ঠোঁটে।
দাদু তখন চ্যাঁচিয়ে কয়
হলো সর্বনাশ
নোটগুলো সব কেটে কেটে
বানালো রে ঘাস।
আমার ছিল অনেক কয়েন
মাটির ব্যাংকে ভরা
দাঁত দিয়ে তা যায় না কাটা
যায় না তাকে ধরা।
তাই তো বলি নোটের চেয়ে
কয়েন অনেক ভালো
নানান রকম ছবি আছে
ঝকমকে তার আলো।

সপ্তম শ্রেণি, সিদ্দিরগঞ্জ রেবতি মোহন পাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

জাদুর কয়েন

মোছা. আবিদা সুলতানা

বাবা-মা হারা মেয়ে রুবির একমাত্র আশ্রয় চৌধুরি পরিবার। এ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া, পোশাক মিললেও মেলেনি বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ। তবে চৌধুরি সাহেবের মেয়ে ছবি তাকে অনেক কিছুই শেখায়। প্রাতিষ্ঠানিক না হলেও শিক্ষা গ্রহণ করছে রুবি। সারাদিন ক্লান্তিহীনভাবে বাড়ির সব কাজ নিপুণ হাতে করে এ বাড়ির সবার প্রিয় হয়েছে এ মেয়েটি। চৌধুরি সাহেব ব্যবসায়ী। রোজ নিজের মেয়ে ছবিকে এবং রুবিকে কয়েন এনে দিতেন। ছবি কী করত জানি না কিন্তু রুবি সেগুলোকে একটি মাটির কলসির মধ্যে রাখত আর এগুলো দিয়ে সে একটা বাড়ি বানাতে চাইত। নিত্যদিনের মতো আজ চৌধুরি সাহেব রুবিকে একটা পাঁচ টাকার কয়েন দিয়েছে। রুবি সেটা হাতে নিয়ে দেখছে। হঠাৎ কয়েনটা একটা বাড়ি হয়ে গেল। কয়েনের বাড়ি। সামনে শাপলা ফুলের দরজা। রুবি একটা পাপড়ির খিল খুলে বাড়িতে ঢুকল। কিন্তু এটা বাড়ি নয়, একটা রাজ্য। রাজ্যের মধ্যে কোনো মানুষ নেই, শুধু কয়েন আর কয়েন। কয়েনই এখানে পড়াশুনা করে, রান্না করে, বাজার করে ইত্যাদি। তাই এ রাজ্যের নাম কয়েন রাজ্য। রুবি একটি ব্রিজ দেখতে পেল। ব্রিজ দিয়ে সে পৌঁছল এক টাকার কয়েনের বনে। এ বনের গাছপালা কয়েনের তৈরি। ফুল-ফল কয়েন। এ বনে অনেক হরিণ দেখতে পেল। এ বনের রাজা গাছ রুবিকে একটা ফুল দিল। রুবি সেটা সাথে নিয়ে চলতে থাকল। এবার সে দুই টাকার কয়েনের গ্রামে আসলো। এখানে সুখি পরিবার ও শিক্ষিত পরিবারের সাথে দেখা হলো। তারা মাথায় কয়েনের মুকুট পড়ে। এদের একজন রুবিকে একটা মুকুট দিল। রুবি খুশি হয়ে সামনে চলতে চলতে কয়েনের গ্রামে নদীতে আসলো। এখানে সে নৌকায় উঠে তীরের পাড়ে যেতে শুরু করল। সে কয়েনের চকচকে পানিতে স্পষ্ট দেখতে পেল ১, ২, ৪, ১৬, ৮ আনা ২৫, ৫০, ০৫ পয়সা মৃত হয়ে নদীতে ডুবে আছে। নদী পার হয়ে সে তার কয়েনের অপর পিঠে পৌঁছে। এখানে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি দেখতে পেল। সে কয়েন রাজ্যে পাওয়া ফুলটা সেখানে দিতেই কোটি কোটি ফুল ঝরতে থাকল। রুবির খুশি দেখে কে। অতঃপর সে একটা কয়েনের জামা ও মুকুট দেখতে পেল। কয়েন রাজ্যের দূত তার কাছে সংবাদ দিতে এসেছে যে এগুলো তার জন্য এবং তাকে মহারানি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। রুবি যখনই জামাটি পড়ছে অমনি তাকে কে যেন ডাকল আর ঘুমটা ভেঙে গেল। রুবি ভাবল এটা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন সে আয়না দেখল, দেখতে পেল তার জামায় কয়েনের ছাপ। হাতের আংটি হয়ে জ্বলছে সেই পাঁচ টাকার কয়েন। সে কী মনে করে মাটির কলসির দিকে গেল। অদ্ভুত। যে কলসি অর্ধেক ছিল আজ সেটি কয়েনে পূর্ণ। বালিশে সেই সুন্দর মুকুট ও ফুল। অথচ ছবি যখন রুবির ঘরে আসলো ঠিক সেই মুহূর্তেই সবকিছু আগের মতো হয়ে গেল। মুকুট ফুল উধাও। তখনই ৫ টাকার কয়েনের আংটিটা গলার লকেট হয়ে। তারফলে ছবি দেখতে পেল না। এখন রুবির যা ইচ্ছা করে, কয়েনটির কাছে বললেই তা এসে যায়। বলো তো, আমি এসব কী করে জানলাম? গতকাল স্বপ্নে রুবি নামের মেয়েটি সেই কয়েনের মাধ্যমে এসে আমাকে জানালো। আর আমি তোমাদেরকে জানালাম নবারুণে।

দশম শ্রেণি, গংগাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গংগাচড়া, রংপুর।

স্কুল ব্যাংকিং

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা তাই স্কুল ব্যাংকিং। দেশের মোট জনসংখ্যার বড়ো একটা অংশ স্কুল শিক্ষার্থী। স্কুল ব্যাংকিং হলো ছেলে-মেয়েদের অর্থ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও সঞ্চয় করার মনোভাব এবং অভ্যাস গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। স্কুল ব্যাংকিং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। কমনওয়েলথ স্কুল ব্যাংকিং অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের স্কুল ব্যাংকিং একটি জনপ্রিয় সঞ্চয় বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খরচ কমানোর মাধ্যমে সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলার নিমিত্তে এ ধরনের ব্যাংকিং এর শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে শুরু হয় স্কুল ব্যাংকিং। এর উদ্যোগ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। স্কুল ব্যাংকিং-এ যারা টার্গেট গ্রুপ ১১ থেকে ১৭ বছরের তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী এবং যাদের কোনো আয়ের উৎস নেই। তারা নানা সময় তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের থেকে বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে বা টিফিন বাবদ টাকা পায়। সেই টাকা বাঁচিয়ে জমা রাখার মানসিকতায় স্কুলের নিকটস্থ ব্যাংক শাখায় একটি সেভিংস হিসাব খোলার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই স্কুল ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ছোটোবেলা থেকেই ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম-কানুন, হিসাব পরিচালনার দক্ষতা ও অভ্যাস গড়ে তুলতে পারদর্শী হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা অযথা খরচ না করে ব্যাংকে জমিয়ে রাখলে একসময় সুফল বয়ে আনবে।

স্কুল ব্যাংকিং এর সুদূর প্রসারী সুফল ও বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যারা স্কুল ব্যাংকিং এর সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদের নামে একটি সেভিংস হিসাব খুলবে এবং হিসাব চলমান রাখবে তারা স্কুল

শেষে যে কলেজে পড়বে সে কলেজের নিকটবর্তী শাখায় স্থানান্তর করতে পারবে।

স্কুল ব্যাংকিং এর সেবা বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায়ই পৌঁছেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রায় ৫৭টির মতো ব্যাংকে রয়েছে স্কুল ব্যাংকিং স্কিম। সরকারি ব্যাংকে তো আছেই সাথে সাথে বেসরকারি ব্যাংকগুলোও এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে। এসব ব্যাংকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় অ্যাকাউন্ট খুলেছে ১৪ লাখ। এসব অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ১ হাজার ৪৪১ কোটি লাখ টাকা। এর মধ্যে শহরের স্কুলের শিক্ষার্থীদের খোলা ৮ লাখ ৮৯ হাজার ২৯টি হিসাবে জমা হয়েছে ৯৪৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। আর গ্রামের ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৯০৭ জন শিক্ষার্থীর হিসাবে জমা হয়েছে ৪১৮কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

স্কুল ব্যাংকিং এর নীতিমালা

বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে যারা ছয় থেকে আঠারো বছর বয়স তারা সবাই স্কুল ব্যাংকিং-এর আওতায় হিসাব খুলতে পারবে। এই হিসাব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তার বাবা-মা অথবা আইনগত অভিভাবকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। হিসাব খোলার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র, অভিভাবকের সর্বশেষ মাসের বেতন রশিদের সত্যায়িত অনুলিপি দিতে হবে। এসব কাগজপত্র ব্যাংক সংরক্ষণ করবে।

ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র এবং উপরোক্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে নিয়ে ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ব্যাংক আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে তাৎক্ষণিক হিসাব খুলে দেবেন। বিনামূল্যে এ ধরনের হিসাব খোলা যায়। এ হিসাবের জন্য কোনো চেকবই দেওয়া হয় না।

এছাড়া তিন কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি নমিনির সত্যায়িত পাসপোর্ট ছবি, নমুনা স্বাক্ষর কার্ড ও লাগবে।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার পর মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়ে নিজের নামে শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলার করে দিয়ে সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে সে ধারা অব্যাহত আছে এবং দিন দিন বেড়েই চলছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের পাল্লাও ভারি হচ্ছে। জমানো এ টাকা বিনিয়োগ হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে।

আমার সোনার বাংলাদেশ

জাহানারা জানি

সবুজ সবুজ স্বপ্নে ভরা
নেই সবুজের শেষ
লাল টুক টুক পলাশ ফোটা
সোনার বাংলাদেশ।
এখানে ওই শান্ত বিলের জলে
লালপদ্ম নীলপদ্ম
হাসে যে দিল খুলে
নীলাকাশের হালকা মেঘের ছায়া
ছড়িয়ে পড়ে শান্ত কাজল জলে
শুনে শুনে হাজার পাখির গান
দখিন হাওয়ায় জুড়িয়ে আসে প্রাণ
বুনো হাওয়ায় ওঠে দুলে দুলে
বেতুল বনের চির সবুজ কেশ
আমার সোনার বাংলাদেশ।
এখানে যে হাজার নদীর বুকে
পাল উড়িয়ে যায়রে ভাটির মাঝি
কে জানে রে যায়রে কতদূর
তারার সাথে কথার মালা গেঁথে
মনের সুখে গায় যে ভাটি সুর
এ যেন এক রূপকাহিনীর দেশ
কথার মালায় গেঁথে হীরামনি
হয় না কভু শেষ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

নীতুর বন্ধু ডলফিন

তাহমিনা রহমান নিশাত

আমার নাম নীতু।

আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। আমার স্কুলের নাম উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

আজ রবিবার। সকাল দশটা বাজে। অন্য দিন হলে এতক্ষণে আমাকে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হতো। কিন্তু আজ আমার ছুটি। আগামী দশ দিন আমাকে স্কুলে যেতে হবে না। কারণ আমার স্কুল দশ দিন বন্ধ। মামণি বলেছে, স্কুল বন্ধ মানেই পড়াশোনা বন্ধ নয়। প্রতিদিন কিছু কিছু পড়াশোনা করা উচিত। সেটা যে-কোনো বই হতে পারে।

আমি আমার গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসলাম। এটা জাফর ইকবালের লেখা। লেখক জাফর ইকবালের সাথে আমার অনেকগুলো ছবি আছে। সে আমার প্রিয় লেখক।

কিছুক্ষণ গল্পের বই পড়ে আমি মামণির কাছে গেলাম। মামণি কাজ করছে। আমি তেমন কোনো কাজ পারি না। তবু মামণিকে বললাম, আমি তোমার সাথে কাজ করি?

মামণি বলল, তোমার যদি কষ্ট না হয় তাহলে করো, তবে সাবধান।

আমি কাজ করতে করতে বললাম- মামণি, চলো না কোথাও বেড়াতে যাই।

মামণি বলল- কোথায় যেতে চাও?

আমি বললাম- কক্সবাজার!

মামণি বলল- সে তো অনেক দূর!

দূর হলেই তো ভালো। পথে কত কিছু দেখা যাবে!

এত করে যখন বলছিস, তখন ঠিক আছে। কিন্তু তোর বাবা যেতে পারবে তো?

দাঁড়াও। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করছি।

আমার বাবা একটা ব্যাংকে চাকরি করে। সে আমার প্রিয় বন্ধু। আমি বাবাকে ফোন করে বললাম-

বাবা, আমার স্কুল তো ছুটি। এই ছুটিতে কক্সবাজার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, কক্সবাজার যাবে? তাহলে তো খুবই মজা হবে!

আমি খুশি হয়ে মামণির কাছে গেলাম। বললাম- মামণি-বাবা রাজি হয়েছে। মামণি বলল, তাহলে তো হয়েই গেল। আমি বললাম, সত্যি! হুররে ...! কিন্তু কবে যাব? মামণি বলল, দেরি করা যাবে না। আগামীকালই রওনা হবো। আমি বললাম, কী মজা! তাহলে আমি সবকিছু গোছাই? মামণি মিষ্টি হেসে বলল, ঠিক আছে।

দেখতে না দেখতে সকাল হয়ে গেল। আমরা ফকিরাপুল থেকে কক্সবাজারের গাড়িতে উঠলাম। ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় লাগে। বারো ঘণ্টা অনেক সময়। আমি গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জেগে দেখি বারো ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমরা কক্সবাজারে পৌঁছে গিয়েছি।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। আমাদের রুম নম্বর ছিল ২১০। এটা দোতালায়। রুমের বারান্দা থেকে সাগরের গর্জন শোনা যায়। আমি বললাম, আমি খুব হাঁপিয়ে গিয়েছি। বাবা বলল, তাহলে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। আমি শুয়ে পড়লাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত তিনটা বাজে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি টর্চলাইট নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। বাইরে সমুদ্রের প্রবল গর্জন। আমি রুমের ভিতরে এসে মামণিকে বললাম, মামণি- আমি সমুদ্রের কাছে যাব। মামণি বলল, এখন লক্ষী মেয়ের মতো ঘুমাও। সকাল হলে অবশ্যই যাব।

সকালে আমি, বাবা আর মামণি হোটেলের ক্যান্টিনে নাশতা শেষ করলাম। এরপর সমুদ্র দেখতে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেলাম। সমুদ্র অনেক বড়ো। আর অনেক বড়ো বড়ো ঢেউ। একটা নদী সমুদ্রের সাথে মিশে গেছে। আমি নদীর তীরে গেলাম। এখানকার ঢেউ ছোটো ছোটো।

নদীতে কেউ লাফ দিচ্ছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, একটি ছোট্ট ডলফিন। ওর গায়ের রং গোলাপি। লাফাতে লাফাতে ডলফিনটা আমাকে দেখল। আমাকে দেখে ওর লাফালাফি আরো বেড়ে গেল। মনে হয় আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে। ও এক ধরনের শব্দ করল। কিন্তু আমি পরিষ্কার ওর কথা বুঝতে পারলাম।

ডলফিনটা বলল- তুমি কে?

আমি বললাম— আমি নীতু। তুমি কে?

ডলফিনটা বলল— আমার নাম গোলাপি। আমি বললাম- এটা কারো নাম হয়! ডলফিনটা বলল- অবশ্যই হয়। যার যে রকম গায়ের রং, তার সেই নাম হতে হয়। বরং তোমার নামটাই অদ্ভুত। আমি বললাম- আমার নাম অদ্ভুত! কেন? ডলফিনটা বলল- তোমার গায়ের রং ফরসা। তাই তোমার নাম হওয়া উচিত ফরসা বুড়ি অথবা ফরসা বুত্তন।

ছোট্ট ডলফিনটার কথা শুনে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। খিলখিল করে হেসে ফেললাম। আমার সাথে সাথে ডলফিনটাও হেসে উঠল, আর লাফাতে লাগল। আমি বললাম, তুমি কোথায় থাকো? ডলফিনটা বলল, আমি অ-নে-এ--ক দূর থেকে এসেছি। আমি বললাম, তুমি একা এসেছ? ডলফিন বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, কেন একা এত দূর এসেছ! তোমার বাবা-মা চিন্তা করবে না!

বাবা- মার কথা মনে হতেই ডলফিনটা কেঁদে ফেলল। বলল, আমি হারিয়ে গিয়েছি। এই বলে সে এ্যাঁ এ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, কেঁদো না প্লিজ। তুমি আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো। আমার কথায় ডলফিনটা মনে হয় কিছুটা খুশি হলো। সে কান্না থামিয়ে বলল- আমি কোথায় এসে পড়েছি?

আমি বললাম, এটা কক্সবাজার। ডলফিনটা বলল, তুমি আমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবে? আমি বললাম, আমিও তো ছোটো, কিন্তু চেষ্টা করব। তুমি যেখান থেকে এসেছ, সে জায়গার নাম কী? ডলফিনটা বলল- অনেক দূরে একটা নদী আছে না? নদীর ধারে একটা পাহাড় আছে না? আমি ওখানে থাকি। আমি বললাম, ধুর বোকা, ওভাবে কেউ জায়গার নাম বলে? ডলফিনটা বলল, আমাকে বোকা বলবে না। এই বলে সে আবার কাঁদতে লাগল-এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ।

আমি বললাম- কেঁদো না প্লীজ। তুমি অ-নে-ক লক্ষী, অ-নে-ক বুদ্ধিমান। ডলফিনটা কান্না থামিয়ে বলল- সত্যি বলছ? আমি লক্ষী! আমি বললাম, তুমি অবশ্যই অ-নে-ক লক্ষী আর বুদ্ধিমান। ডলফিনটা বলল- তুমি তোমার নাক ছুঁয়ে বলো। আমি নাক ছুঁয়ে বললাম- তুমি অ-নে-ক লক্ষী আর বুদ্ধিমান।

ডলফিনটা বলল- তুমি আমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবে?

আমি বললাম, অবশ্যই চেষ্টা করব। কিন্তু, তোমাকেও তো ঠিকভাবে ঠিকানা বলতে হবে। আমার মামণি

বলেছে- সবারই ঠিকানা জানাটা জরুরি। ডলফিনটা বলল- ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে ঠিকানাটা শিখে ফেলব। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- আচ্ছা, তুমি এই নদীটা ধরেই তো এসেছ, তাই না? ডলফিনটা বলল- হ্যাঁ। এর পর আমি আমার বুদ্ধি খাটালাম এবং তার পাহাড় এবং নদীটাকে চিনতে পারলাম। আমি বললাম- তোমাদের পাহাড় এবং নদীটা আমি চিনতে পেরেছি। লোকে এই পাহাড়কে রঙিন পাহাড় বলে ডাকে। একদিন আমরা সেখানে পিকনিক করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না। ডলফিনটা বলল, কেন পারবে না? আমি বললাম- কারণ আমার স্কুল আর কয়েকদিন পর খুলে যাবে। কিন্তু তোমাদের ওখানে যেতে অনেকদিন লাগবে। ডলফিনটা বলল, তাহলে কবে নিয়ে যাবে? আমি বললাম- সামনে গ্রীষ্মে আমাদের স্কুল অনেক দিন বন্ধ থাকবে। তখন তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো। ডলফিনটা বলল, তোমাদের দেশে কী আমাদের নদীটা আছে? আমি বললাম- আছে, তবে একটু দূরে। ডলফিনটা গাল ফুলিয়ে বলল- তাহলে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের বাড়ি যাব। ডলফিনটার আহ্লাদে ভাব দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমি বললাম- আমাদের সাথে কীভাবে যাবে? ডলফিনটা বলল, তোমাদের ঘর থেকে একটা বাটি নিয়ে আসো, দেখো আমি কী করি। আমি বললাম, তাহলে তোমাকে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমরা পাঁচ দিন পর বাড়ি যাব। তখন তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে যাব। ডলফিনটা বলল, ঠিক আছে।

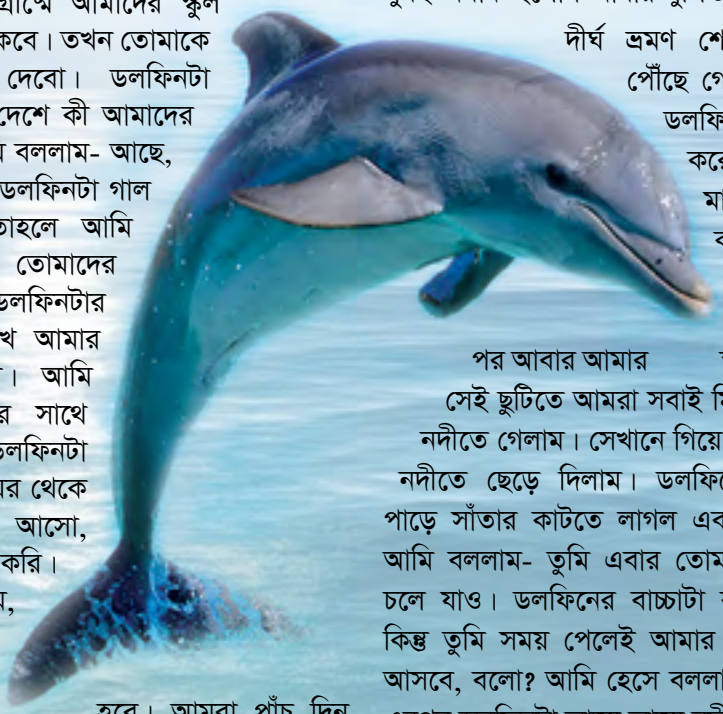

দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেল। আমাদের বাড়ি ফেরার দিন এসে গেল। আমি ডলফিনটার কাছে গেলাম। দেখলাম সে নদীর তীর ঘেঁষে সাঁতার কাটছে। আমাকে দেখে সে দ্রুত আমার কাছে ছুটে এল। ডলফিনটা বলল- বাটি নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, এই যে বাটি। দেখতে দেখতে ডলফিনের বাচ্চাটা বাটির চেয়েও ছোটো হয়ে গেল। তারপর এক লাফ দিয়ে বাটির ভিতর চলে গেল। আমি ডলফিনের জাদুকরী ক্ষমতা দেখে খুবই অবাক হলাম। ডলফিনটা ফিসফিস করে বলল। আমি এই বাটিতে করে তোমাদের সাথে যাব। আমি বিস্ময় নিয়ে বললাম- ঠিক আছে!

এরপর, আমরা সবাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমি আমার মামণির পাশের সিটে বসলাম। মামণি জিজ্ঞাসা করল- বাটিতে কী আছে? আমি কিছু বললাম না। বাবা বলল- মামণির প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, পাপা। এরপর আমি মামণি আর বাবার কাছে সব কিছু খুলে বললাম। সবকিছু শুনে মামণি এবং বাবা খুবই অবাক হলো। আবার খুশিও হলো।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে আমরা বাসায় পৌঁছে গেলাম। বাসায় আমি ডলফিনটার বাচ্চাকে যত্ন করে পালতে লাগলাম। মামণি ও বাবা এ কাজে আমাকে সাহায্য করল। এরপর অনেক দিন পর আবার আমার স্কুল ছুটি হলো। সেই ছুটিতে আমরা সবাই মিলে রঙিন পাহাড়ের নদীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে ডলফিনের বাচ্চাকে নদীতে ছেড়ে দিলাম। ডলফিনের বাচ্চাটা নদীর পাড়ে সাঁতার কাটতে লাগল এবং লাফাতে লাগল। আমি বললাম- তুমি এবার তোমার বাবা-মার কাছে চলে যাও। ডলফিনের বাচ্চাটা বলল- ঠিক আছে। কিন্তু তুমি সময় পেলেই আমার সাথে দেখা করতে আসবে, বলো? আমি হেসে বললাম- ঠিক আছে বন্ধু! এরপর ডলফিনটা আস্তে আস্তে নদীর মাঝে চলে গেল। আমরাও বাসায় ফিরে এলাম। এরপর অনেকদিন হয়ে গেছে। ডলফিনটাও আগের চেয়ে আরো বড়ো আর সুন্দর হয়েছে। আমি ছুটি পেলেই ডলফিনটার সাথে দেখা করতে যাই। সে আমাকে দেখে অনেক খুশি হয়। সে আমার খুব ভালো বন্ধু।

দ্বিতীয় শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাঠুরিয়ার গান

নূর সিদ্দিকী

অনেকদিন আগের কথা। এক বনে বাস করতো এক কাঠুরিয়া। বনের মরা গাছ কেটে বাজারে বিক্রি করেই সংসার চলতো তার।

ওই বনে ছিল একটা দুষ্টু বাঘ। কাঠুরিয়াকে দেখলেই হালুম করে ভয় দেখাতো। ভয়ে দৌড়ে পালাতো কাঠুরিয়া।

কাঠুরিয়া ভয় তাড়াতে গান গাইতো। বাঘটা যদি ধরতে পারি আমি দেবো সাগর পাড়ি।

একদিন কাঠুরিয়ার এই গান শোনে এক শেয়াল। শেয়ালকে সবাই বলে শেয়াল পণ্ডিত। শেয়াল কাঠুরিয়াকে বলে- তুমি এই গান করছো কেন কাঠুরিয়া ভায়া। কাঠুরিয়া বলে- এটা আমার ভয় তাড়ানো গান।

শেয়াল কাঠুরিয়াকে বলে- বাঘকে কি কেবল গান গেয়ে কাবু করা যাবে?

বাঘের ভয়ে আমরাও তো বনে বসবাস করতে পারি না শান্তিতে। তবে তোমার এই গানটা একটা উপায় হতে পারে।

কাঠুরিয়া বলে- বাঘের ভয়ে না খেয়ে থাকতে হয়। একটা উপায় বের করো। সত্যিই যদি বাঘটাকে ধরতে পারতাম, তবে উচিত শিক্ষা দিতাম।

শেয়াল বনের সব পশুদের ডেকে সভা করে। শেয়াল সবাইকে কাঠুরিয়ার গান শোনায়- বাঘটা যদি ধরতে পারি আমি দেবো সাগর পাড়ি।

সবাই বলে- এ আবার কেমন গান। তুমি কি গান শোনাতে সভা ডেকেছো? বাঘের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে ভালো লাগে না। গান না গেয়ে উপায় বলো। শেয়াল সবাইকে বাঘ তাড়ানোর উপায় বলে দেয়।

পরদিন কাঠুরিয়া গান করতে করতে বনের দিকে যাচ্ছিল। আড়াল থেকে দুষ্টু বাঘ গানটি শোনে। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না।

ওই গানের কথা ভাবতে ভাবতে বাঘ যাচ্ছিল। তার সামনে আসে একটা খরগোশ। খরগোশ বলে- মহারাজকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? বাঘ বলে- কাঠুরিয়ার গানটা বুঝতে পারলাম না। খরগোশ বলে- ওটা কিন্তু ভয়ংকর গান। বাঘ আরো ভয়

পেয়ে যায়।

এবার বাঘের সামনে আসে হরিণ। বলে- মহারাজ চিন্তিত নাকি? বাঘ বলে- কাঠুরিয়ার গানটা বুঝতে পারলাম না। হরিণ বলে- ওটা খুবই ভয়ংকর গান। বাঘের ভয় আরো বেড়ে যায়।

বাঘের সামনে আসে একটা হাতি। শুঁড় উচিয়ে বলে- মহারাজ কি ভয় পেয়েছেন? বাঘ বলে- কাঠুরিয়ার গানটা বুঝতে পারলাম না। হাতি বলে- এবার আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। ভয়ে বাঘের শরীর কেঁপে ওঠে।

এবার বাঘের পথ আগলে দাঁড়ায় শেয়াল পণ্ডিত। শেয়ালকে দেখে বাঘ বলে- সবাই বলছে কাঠুরিয়ার গানটা নাকি খুব ভয়ের। কী করি বলো তো পণ্ডিত।

শেয়াল বলে- আমি শুনেছি ওই গান। আপনার বিপদের কথা ভেবেই এলাম। কাল সকালেই নাকি কাঠুরিয়া আপনাকে ধরে সাগর পাড়ি দেবে। কী বিপদের কথা। আপনি না থাকলে আমরা মহারাজ মানবো কাকে?

বাঘ বলে- আগে তো প্রাণটা বাঁচাতে হবে। রাজা-মহারাজা তোমরা যাকে খুশি বানাও আমার বাঁচার উপায় বলো।

শেয়াল বলে- আপনি পশুরাজ। আপনাকে কি এই ছোটো বনে মানায়? পাশের বড়ো বনে চলে যান। ওখানে কাঠুরিয়া যাবে না, আপনারও বিপদ হবে না।

বাঘ বলে- খুব ভালো বলেছো। তাই করি। আমি বড়ো বনেই চলে যাই।

এরপর কাঠুরিয়া আর সব পশুপাখি শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। কাঠুরিয়ার গানটা এখন সবাই মিলে গায় আর হাসে।

রোদুর পুতুল

মাহমুদউল্লাহ

রোদুমণির পুতুলটাকে সবাই করে হেলা,
এই নিয়ে তার মনের মাঝে দুঃখ আছে মেলা।
এই তো সেদিন দুপুর বেলা রোদু বলল মাকে,
খাইয়ে দেব এখনি মা আমার পতুলটাকে।
মা শুনে কন, কোনো কিছু পুতুলে খায় নাকি।
ঘরের সবাই খাবার খেলো, পুতুল রইল বাকি।

কদিন আগে রেলগাড়িতে মামার বাড়ি যেতে,
পুতুলটাকে বসিয়ে সিটে রোদু ওঠে মেতে।
চিলের মতো ছোঁ মেরে মা পুতুল নিলেন তুলে,
বলেন, ওদের সিট থাকে না, যেয়ো না তা ভুলে।
প্রশ্ন করে রোদু তখন জ্ঞানী-গুণী যেন,
সবার থাকলে পুতুলমণির সিট থাকে না কেন?

রোদু গেল হাসপাতালে মা ও দাদির সাথে,
টুকটুকে লাল পুতুলটাকে রেখেছিল হাতে।
ডাক্তারও কম যান না, শুধান সবার রোগের কথা,
পুতুলমণির বেলা তবে কেন নীরবতা?
কালকে থেকে পুতুলমণির ভীষণ রকম জ্বর,
তার কথা কেউ শুধালো না, সবাই কী তার পর?

আষাঢ়ে

শাশ্বত ওসমান

আকাশ করেছে কালো
নিভে গেছে সব আলো,
চারদিক নিকষ অন্ধকার
বাইরে যায় সাধ্য কার?

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক
মারছে যেন জোরে ধমক,
বইছে জোরে বৃষ্টির ধারা
বাইরে রয়ে গেছে কারা?

পড়েছে ভেঙে গাছের ডাল
জলে ভরে গেছে হাওর-খাল
নদীতে জাল পেতেছে জেলে
বৃষ্টিতে ভিজছে এ কার ছেলে!

বাগানে ফুটেছে কদম কেয়া
নদীর ঘাটে বাঁধা নেই খেয়া,
আষাঢ়ে নেমেছে অঝোর বৃষ্টি
ফুলে-ফসলে প্রকৃতিতে কত যে সৃষ্টি।

আষাঢ়

ইশরা হোসেন

আষাঢ় এলে বৃষ্টি নামে
নতুন প্রাণের বার্তা আনে
রুক্ষ হওয়া গাছগাছালি
ছন্দ পায় নতুন করে।
নীল আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা
নদীনালা পানিতে ভরা
মাঝে মাঝে মেঘের মাঝে
সূয্যি মামা জেগে ওঠে।
ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাতে
পৃথিবীটা কেঁপে ওঠে।
এমনি দিনে ঘরের বাইরে
যায় না যেতে মন।
সারা দিন বৃষ্টির শব্দে
কেটে যায় ক্ষণ।

একাদশ শ্রেণি পরীক্ষার্থী, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

মেঘের কান্না

সৈয়দ মাশহুদুল হক

মেঘ গুড়গুড় মেঘ গুড়গুড়
ঢেকে আকাশ নীল
যায় উড়ে যায় দূর পাহাড়ে
রোদে দিয়ে খিল।
টাপুর টুপুর মেঘের নূপুর
বাজে সারাবেলা
রিনিঝিনি বাদল ঝরে
মাঠে জলের মেলা।
বাদল মানে মেঘের কান্না
ঝমঝমাঝম সুর
খাল-বিলে জলের খেলা
অথৈ সমুদ্দুর।

বৃষ্টি দিনের গল্প

রুদ্র সাদাত

বৃষ্টি পড়ে ঝরে ঝরে
আনন্দ করি বেশ,
সে আনন্দে মেতে উঠে
আমাদের দেশ।
ঝড় হয় বাতাস বয়
আর পড়ে আম,
কাঁঠাল গাছে মুচি ধরে
জাম গাছে জাম।
আম খাই জাম খাই
আর খাই লিচু ,
খাবে যদি কাছে এসে
নিতে পারো কিছু।

প্রথম শ্রেণি, শুকতারা বিদ্যা নিকেতন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

বাদল মেঘে

মনসুর জোয়ারদার

বাদল মেঘে মাদল বাজে
বর্ষা এলে ফিরে
কাজল কালো আকাশ ছুঁয়ে
বৃষ্টি নামে ধীরে।
বৃষ্টি দেখো কেমন রূপে
ছন্দে ঝরে অই
পাতার ফাঁকে ঘরের চালে
বেড়ায় খুঁজে সই।
কদম কেয়া ফুলের বনে
খুশির দোলা জাগে
ভ্রমর আসে খবর নিতে
সবার চেয়ে আগে।
গুড়গুড়ানি দেয়া ডাকের
হৃদয় কাঁপা সুরে
তাল মিলিয়ে ব্যাঙ যে নাচে
পানির মাঝে ঘুরে।

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি ঝরে

আনোয়ারুল হক নূরী

সারা আকাশ টলমল মেঘের শামিয়ানা।
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি ঝরে সারা দিন একটানা।
বর্ষা মেয়ে জল গালিচা বিছিয়ে দিল আজ।
দুরন্ত সব ঢেউরা বোনে মিষ্টি কারুকাজ।
আকাশ জুড়ে এদিক ওদিক মেঘের ছোটাছুটি।
পুকুর জলে দল বেঁধে সব নেচেছে সরপুঁটি।
দুপুর বেলা বৃষ্টি নূপুর ঝম ঝমা ঝম বাজে।
বিজলি মেয়ের হাসির ঝলক মেঘের কারুকাজে।
বিলে ঝিলে উল্লাসে সব ব্যাঙের নাচন দেখে।
ঢোঁড়া সাপে সাঁতার কেটে ছুটছে এঁকেবেঁকে।
মেঘলা দিনে একলা আপু জানালা ধরে দাঁড়ায়।
স্মৃতির পাড়ায় আপুমণি অজান্তে মন হারায়।
জল থই থই জলের খেলা মাঠঘাট ডুবু ডুবু।
কাটতো ছড়া কোলে নিতো নেই এখন বুবু।
যে যার ঘরে কেমন যেন সবাই আপন হারা।
জুঁইয়ের ডালে জড়সড় কাকটা ভিজে সারা।
হাওয়ার তোড়ে ওড়ে না আর বলাকা ঝাঁক ধরে।
পারুল বাড়ির জারুল গাছে জল টুপটুপ ঝরে।
মাথাল মাথায় ধান বুনেছে ওই যে চাষি দূরে।
ঝুপ ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি ঝরে এক টানা এক সুরে।
জলের উপর টুপ করে যেই বৃষ্টি ফোঁটা ঝরে।
চুপ করে রয় কাচের মতো জলের টোপর পরে।
খুটায় বাঁধা শূন্য খেরো নেইতো মাঝি ঘাটে।
ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝরছে শুধু রাখাল শূন্য বাটে।

বর্ষার বৃষ্টি

আলেয়া বেগম

বৃষ্টি পড়ে টুপটাপ
চারদিক চুপচাপ
ব্যাঙ ধরেছে ছাতা
ভিজবে না আর মাথা
কাক ভিজছে ডালে
শাপলা হাসছে জলে
আকাশ মেঘে ঢাকা
রাস্তাঘাট ফাঁকা

অষ্টম শ্রেণি, আরামবাগ গার্লস স্কুল, ঢাকা।

বৃষ্টি

নেহা হোসেন

রিমঝিম বৃষ্টিতে
ডুবে পথঘাট
আরো যায় ডুবে
প্রিয় খেলার মাঠ।

লাফিয়ে পানিতে পড়ে
দুষ্টু ছেলের দল
আবার কাদা মাটিতে
খেলে ভিজে ফুটবল।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

ধারাবাহিক গল্প

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

মুক্তিযুদ্ধের জুলাই মাসের গল্প হবে। গল্প বলবেন, বড়োচাচা ও মুহিব চাচা।

মুহিব চাচা প্রশ্ন করলেন, মুক্তিযুদ্ধে কোন বড়ো দুই শক্তি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল?

শিলা আপার বন্ধু রীতা আপা বলল, আমেরিকা আর চীন।

ঠিক। তবে আমেরিকার সাধারণ নাগরিক আমাদের পক্ষে ছিল। অনেক প্রথম শ্রেণির নাগরিকও আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। যাহোক আমেরিকান সরকার পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি অব্যাহত রাখে। আমাদের এখান থেকে লুট করা টাকা নিয়ে পাকিস্তান অস্ত্র কিনে। সেই অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকেই মারে। মগের মুল্লুক আর কী। জুলাই মাসের ১ তারিখে কয়েক হাজার বাংলাদেশি শরণার্থী কলকাতায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মার্কিন কংগ্রেস সদস্য কর্নেলিয়াস গ্যালঘার মার্কিন প্রতিনিধি সভায় পাকিস্তানের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে বিধিনিষেধ জারির জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানান।

বড়ো চাচা তাকালেন মুহিব চাচার দিকে। বললেন, জুলাই-এর ২ তারিখে ব্রিটিশ টেলিভিশনকে দেওয়া খালেদ মোশাররফের সেই সাক্ষাৎকারটার কথা তোমার মনে আছে?

মুহিব চাচা ভুরু কুঁচকালেন। বললেন, খালেদ মোশাররফ। দুর্ধর্ষ এক মুক্তিযোদ্ধা। তার গোটা বুকটাই ছিল বাংলাদেশ। তিনি ছিলেন দুই নম্বর সেক্টরের প্রধান। বাংলাদেশের সব ব্রিজ উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা আসে তার মাথা থেকে। পাকিস্তানি সৈন্যদের গতিবিধি অচল করে দেবার পরিকল্পনা। তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশে একটি লোক জীবিত থাকা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। নিজ পরিবার সম্পর্কে তিনি বলেন, অন্য বহু পরিবারের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা আমি নিজ চোখে দেখেছি। নিজের কথা চিন্তা করার সময় এখন আমার নেই। গোটা বাংলাদেশ আমার পরিবার।

আমাদের বড়ো চাচি খুব নীরব ধরনের মানুষ। তিনিও চুপ থাকলেন না। বললেন, আমাদের বাড়ি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে আর্মিরা ঢুকত আমাদের গ্রামে। অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালাতো। প্রতিহত করতে চাইত। আমরা অনেক যুদ্ধের খবরাখবর পেতাম। সেরকম একটা যুদ্ধের কথা বলি। ব্রহ্মপুত্র নদের বাহাদুরবাদ ঘাটে পাকিস্তানি আর্মিদের ঘাঁটি ছিল। সেটা জুলাইয়ের ৩ তারিখ। মুক্তিযোদ্ধারা সেই ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ঘণ্টারও

বেশি সময় তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবারুদ বোঝাই একটা বার্জ ডুবে যায়। প্রায় একশজন পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়। আক্রমণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে দুই মাইল ভেতরে একটা চরে অবস্থান নেয়। তাদের সাফল্যের খবর পেয়ে অনেকের মনেই সাহস সঞ্চয় হয়। সেখানেই অনেক যুবক গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বড়ো চাচির কথা শেষ হতেই মুহিব চাচা বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ ভাবি। আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা যুদ্ধের কথা বলেছেন। আসলে এরকম সাফল্য তখন মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই পাচ্ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা মারা পড়ছিল, পিছু হটছিল। ওদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র, গোলাবারুদ দখলে নিচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধারা। আমিও এরকম একটা যুদ্ধের কথা বলব।

আমরা মনোযোগী হলাম। মুহিব চাচা এক গ্লাস পানি খেলেন। তারপর বললেন, জুলাইয়ের ১০ তারিখ। শালদা নদীর কাছে সাগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেই অবস্থানে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারাও মেশিনগান, মর্টার দিয়ে পালটা আক্রমণে যায়। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পেরে উঠে না। আসলে তখন এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। সেই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ৩০/৪০ জন সৈন্য নিহত হয়। তাদের পুরো দল ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে যায়।

মা হঠাৎ বলে ফেললেন, তোমাদের দুইটা প্রশ্ন করতে চাই।

প্রশ্ন! আমরা একটু চমকে উঠলাম। তবে খুব বেশি ঘাবড়ালাম না। মা নিশ্চয় বড়ো চাচা বা বাবার মতো কঠিন প্রশ্ন করবেন না।

মা বললেন, তোমরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনছ। মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ছ। তোমরা কেমন খবর রাখো সে ব্যাপারে একটু জানতে চাই। বলো তো কোথায় এবং কখন সেক্টর কমান্ডারদের প্রথম সম্মেলন হয়?

আমি চুপসে গেলাম। কারণ, আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। আমার বন্ধুরাও চুপ করেই রইল। সমস্যা। কেউ কি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না? তখন দাঁড়ালো শিলা আপার বন্ধু মলি আপা। বলল, ১৯৭১ সালে ১১ই জুলাই কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের অফিস ভবনে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের প্রথম সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন চলেছিল ১৭ই জুলাই পর্যন্ত। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ। অধিবেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের নানারকম সমস্যা ও সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

মা'র মুখে মিটিমিটি হাসি। সে হাসি দেখেই বোঝা যায়, মলি আপা সঠিক উত্তর দিয়েছে। মা বললেন,তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে। আমি কি আরেকটা প্রশ্ন করব?

জি করেন। শিলা আপা আর তার বন্ধুরা উচ্চকণ্ঠে বলল। আমরা অতটা উচ্চকণ্ঠ পেলাম না। মনে হলো, ওরা সিনিয়র। ওরাই সব উত্তর পারবে।

মা বললেন, তোমরা জানো যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক শহিদ হয়েছিল। দুই লাখ মা-বোন লাঞ্ছিত হয়েছিল। বাস্তবিক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে মারামারি করা কঠিন। সেটা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম হোক, আর এক দেশ থেকে অন্য দেশ হোক। নদীমাতৃক বাংলাদেশ। এছাড়া আছে অজস্র খাল, বিল, হাওর। বর্ষায় এসবও হয়ে যায় বৃহৎ নদীর মতোই। আছে ভূমির বৈচিত্র্য। পাহাড়, বন, সমতল। আছে খাবার ও ভাষার ভিন্নতা। সব মিলিয়ে পরিবেশ সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এখানে যুদ্ধ করা ওদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। এত মৃত্যু, এত জ্বালাও-পোড়াও সংঘটিত করা ওদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অল্পতেই ওদের পরাজয় নিশ্চিত হতো। ওরা নয় মাস যুদ্ধ করতে পেরেছে এবং মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা চালাতে পেরেছে তা রাজাকারদের জন্য। বিশ্বাসঘাতক দালালদের জন্য। বাবা-মা-মাটি-ভাইবোনের বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা। ওরা পাকিস্তানি আর্মিদেরকে দেশপ্রেমিক মানুষদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে গেছে। মানুষ মারতে, সম্পদ লুট করতে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে। ওরা নিজেরাও খুন, নারী নির্যাতন, ও লুটপাট করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গি সরকারও ওদের নানারকম সুযোগসুবিধা দিচ্ছিল। অবশেষে জঙ্গি সরকার ওদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষমতাও দিয়ে দেয়। সেই ক্ষমতা পেয়ে ওরা সাধারণ মানুষকে গণহারে গ্রেফতারের সুযোগ পায়। এখন তোমাদের বলতে হবে কবে এবং কোন সামরিক আদেশের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়?

এবার দাঁড়ালো শিলা আপার বন্ধু নেহাল ভাইয়া। বলল, ১৯৭১ সালে ২২শে জুলাই তারিখে সামরিক শাসক ১৫৭, ১৫৮ ও ১৫৯ নং সামরিক আদেশের মাধ্যমে দালাল-রাজাকারদের যে-কোনো লোককে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

মা বললেন, বাহ! তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে।

আমার বন্ধু মোহন দাঁড়ালো। ওর মুখ কিছুটা গোমড়া। বলল, কাকীমা, আপনার সব প্রশ্নের জবাব সিনিয়র ভাইয়া-আপুরা দিয়ে দিচ্ছে। এমন কোনো প্রশ্ন করুন যাতে আমরাও উত্তর দিতে পারি।

মা হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে তাহলে তেমন একটা প্রশ্ন খুঁজে বের করি। মা ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, বলো তো আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক কে? সিনিয়ররা কেউ বলবে না। এ প্রশ্ন শুধু জুনিয়রদের জন্য।

আমরা খুব স্বস্তি বোধ করলাম। খুব সহজ প্রশ্ন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন–এবারের সংগ্রাম–মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম–স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তিনি আরো বলেছিলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। দেশকে স্বাধীন করো।

এ কথার পরে তো স্বাধীনতার ঘোষণার আর কিছু থাকে না। বিশ্ববাসী শুনেছে সেই ভাষণ। বিশ্বের গুটিকতক শ্রেষ্ঠতম ভাষণের একটি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। মার্টিন লুথার কিং-এর 'আই হ্যাভ এ্যা ড্রিম', জর্জ ওয়াসিংটন-এর 'ডেমোক্রেসি' এবং বঙ্গবন্ধুর '৭ই মার্চের ভাষণ' একই কাতারের। সম্প্রতি এই ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' মর্যাদা পেয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ঘোষণাপত্রটি হলো–

'This may be my last message, from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

Sheikh Mujibur Rahman

26 March 1971

যার বাংলা অনুবাদঃ

'ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।'

শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ মার্চ ১৯৭১

বাবা বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ও কৌশলী প্রতিরোধ এবং পালটা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা ও ভীত হয়ে পড়ে। কতটা ভীত ওরা ছিল তার একটি উদাহরণ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

ঘটনাটা ১৯৭১ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের। ঢাকার যাত্রাবাড়ির রাস্তা দিয়ে সারারাত ধরে মিলিটারি ভর্তি বড়ো বড়ো লরি যাতায়াত করে। ওদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাত দশটার পর ওই রাস্তা দিয়ে সব গাড়ি যাতায়াত বন্ধ থাকে। ঘটনার দিন মাঝ রাতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পথের ওপর কয়েকটা ছোটো সাইজের মাইন বসিয়ে দেয়। তাতে দুটো খানসেনা ভর্তি লরি উলটে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। শুরু হয় শব্দ, চেঁচামেচি। রাতের অন্ধকারে চেঁচামেচির শব্দ শুনে যাত্রাবাড়ি চেকপোস্টের আর্মিরা ভাবে, ওখানে নিশ্চয়ই গেরিলারা কিছু করছে। অমনি তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। যেসব আর্মিরা লরি উলটে পড়েছিল তারাও তখন পালটা গুলি করতে থাকে। এভাবে অমাবস্যার অন্ধকারে দুই দল পাকিস্তানি সৈন্য মুক্তিযোদ্ধা ভেবে পরস্পরের মধ্যে সারারাত গুলি বিনিময় করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে অনেক 'সেমসাইড' হওয়ার খবর আমরা পত্রিকায় পড়তাম। আমাদের দেশেও সেটা শুরু হলো। ব্যাপারটা সেই যুদ্ধের দিনেও আমাদের জন্য হাসির খোরাক হয়ে এসেছিল।

ঘটনাটা শুনে আমরা খুব হাসলাম। আমার বন্ধু রিটন বলল, অমন ভীতুর ডিমরা এসেছিল আমাদের দেশে যুদ্ধ করতে!

মুহিব চাচা বললেন, শুধু আর্মিরা না, রাজাকাররাও টাইট হয়ে যেতে থাকে। ওদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল পেতে শুরু করে। ২২শে জুলাই তারিখে সেক্টর কমান্ডার মবাছারুলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল মীরগঞ্জ রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। রাজাকারদের মীরগঞ্জের সাথে চরঘাটের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর জুলাইয়ের ২৬ তারিখে মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার নরসিংহের কাছে সাত পাকিস্তানি দালালকে অ্যামবুশ করে বন্দি করে। মুক্তিযোদ্ধারা দালালদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ডগ্রেনেড, একটি ওয়্যারলেস সেট এবং ১২০ রাউন্ড গুলি দখল করে। ঐ দিনই ভোর পাঁচটায় উপজেলার কালীদাস পাড়ায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি দালালদের মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী খণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে উনিশ রাজাকার নিহত ও সাতজন আহত হয়।

বড়ো চাচা বললেন, শুধু যুদ্ধ নয়, নানারকম ফাঁদে ফেলেও আমরা পাকিস্তানি মগজহীন আর্মিদের ধ্বংস করেছি। ২৮শে জুলাই তারিখের একটা ঘটনা বলি। ইছামতি নদীর তীরে পাকিস্তানি বাহিনীর একটা ঘাঁটি। ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে আমাদের একটি দল (আমাদের বলছি কারণ আমি সেই দলের সদস্য ছিলাম) সেই ঘাঁটির কাছে এক খুঁটিতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। আর তার চারপাশে নিকটবর্তী ধানক্ষেতে পুঁতে রাখে এন্টি পারসোনাল মাইন। পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই পতাকা দেখে। দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা পতাকাটি নামানোর জন্য অগ্রসর হয়। মাইনটির তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। পাকিস্তানি সেনাদের সবাই নিহত হয়। আমরা দূরে আড়ালে বসে দেখছিলাম তাদের ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যু। পরে ক্যাপ্টেন হুদা তাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে দলের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফেরেন।

বাবা বললেন, তখন স্বাধীনতাকামী প্রতিটা মানুষই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কেউ হয়ত সশরীরে যুদ্ধে যায়নি। কিন্তু খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। এসবকে ছোটো করে দেখার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের সহায়তা না পেলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধ করা এত সহজ হতো না। তারপর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মানুষগুলোও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সাহিত্যিকরা জ্বালাময়ী সাহিত্য রচনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবীত করেছেন। বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছেন। শিল্পীরা গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছেন। চলচ্চিত্র শিল্পীরাও সাহায্য করেছেন বিভিন্নভাবে। এ কারণে পাকিস্তানি শাসকদের রোষানলে তাদেরকেও পড়তে হয়েছে। চা খেতে খেতে তিনি সমাপনী টানলেন, এভাবেই প্রতিটা দিনে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটা বিজয় উজ্জ্বল করে তুলছিল আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সম্ভাবনা। আর ওরা পাচ্ছিল পরাজয়ের অশনি সংকেত।

কোনো অন্যায়ই জগতে চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। অপশক্তির পরাজয় অবধারিত।

আমার ময়না

নাহার আহমেদ

আজ খাঁচাটা দাও না খুলে
উড়ব খানিক আনন্দেতে
মুক্ত আকাশটাতে।
ওরে সোনা ময়না পাখি
স্বাধীনতার সাধ বুঝি তোর
জাগে হৃদয়টাতে।
সুরে সুরে আজ যে আমি
গাইব না গান বন্দি খাঁচায়
ভরিয়ে দিতে মন।
খাঁচাখানা খুলে দিয়ে
যখন তাকে কাছে গিয়ে
আদর করে ডাকি
তাধিন তাধিন নেচে নেচে
জয় বাংলা বলে উঠে
আমার ময়না পাখি।

ইলশেগুঁড়ি

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী

ইলশেগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ি
হাওয়ায় ওড়ে পাতার ঘুড়ি
পাতার ঘুড়ির চোখ কানা
ঘুড্ডি উড়াল দেখতে মানা
দেখবে যদি আকাশ ছোঁ
কানামাছি ভো ভো,
ইলশেগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ি
জলে ভেজে পাথর নুড়ি
পাথর নুড়ির কালো রং
দেখতে ভারি জবরজং
দেখতে যদি তোমরা চাও
হাওয়ায় উড়ে সিলেট যাও
ইলশেগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ি
সঙ্গে এনো কমলা ঝুড়ি
কমলা ঝুড়ির দেদার দর
ইলিশ ওঠে পদ্মার চর
ইলিশ যদি খেতে চাও
ইলশেগুঁড়ির সঙ্গে যাও।

বেলফুল

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

বেলের ফুলে দুলে দুলে
নাচছে প্রজাপতি;
দুলিয়ে কোমর ভাবছে ভ্রমর
কী হলো তার গতি!

বেলের গন্ধে মন আনন্দে
নাচ জুড়েছে কাক;
মিষ্টি হেসে দোয়েল এসে
বলল না হয় থাক!

সবুজ বনে মনে মনে
দুলছে সবুজ পাতা;
পুরনো স্মৃতি করে ইতি
শিশির খুলল খাতা।

বেল ফুলেদের প্রত্যাশা ঢের
থাকবে ধরায় বেঁচে;
যেমন করে হৃদয় ভরে
মুক্তা বাঁচে সেঁচে।

বাবুই বাসা

পারভীন আক্তার লাভলী

তালগাছেতে বাবুই বাসা
বাতাসেতে দোলে
কূজনেতে বাবুই ছানা
ঘুমায় বাবুই'র কোলে
যতন করে বাসা বোনে
স্বাধীন বাবুই পাখি
ইচ্ছে করে আমি যেয়ে
ঐ বাসাতেই থাকি।

মৌমাছির কান

সৈয়দ শরীফ

আজকে আমি একটি বিষয়
খুব ভেবেছি- আর
ভাবনা থেকেই নতুন কিছুর
ঘটল আবিষ্কার !
মৌমাছিরা শব্দ শুনে
যেমনি পাখা ঝাঁকায়,
ভাবছি ওদের কান তবে কী
ওই ও দুটো পাখায় !
দেখতে পেলাম একটি মাছি
যাচ্ছে যেন মরে,
ওকেই ধরে দুইটি পাখায়
টান লাগালাম জোরে।
বললাম এখন ওঠ তো দেখি
চুপ মেরে কেন, কী রে?
তারমানে তোর পাখার সাথে
কান নিয়েছি ছিঁড়ে !
ভান কিনা তা দেখতে কাশ ও
খুব চালালাম হাঁচি,
শুনল না তাই শেষমেষে আর
উঠল না মৌমাছি।

ফলের দেশ

শামীম শিকদার

পাড়ার গাছে গাছে আমের মুকুল,
জলে ভরেছে নদীর দু-কূল।
মৌমাছিরা সুরে সুরে গাইছে গান,
ফুল বা পাখি খুঁজছে যেন প্রাণ।
গাছের ডালে গড়েছে তাদের নীড়,
আপন বলে জমায় তারা ভিড়।
পাতার ফাঁকে ফল দিয়েছে উঁকি,
লাল-হলুদে রং দেখেছে খুকি।
বাতাস এলে এদিক সেদিক দুলে,
ফলের ঘ্রাণে মন যে এবার ভুলে।
আমগাছেতে আম ধরেছে বেশ,
এটা যেন আমার ফলের দেশ।

শিক্ষার্থী, কাপাসিয়া কলেজ, গাজীপুর

করি আমি ছড়ার ফেরি

সাঈদ তপু

করি আমি ছড়ার ফেরি
ভুল করো না নিতে
নানান স্বাদের ছড়া পারি
সস্তা দামে দিতে
এসো পাড়ার খোকাখুকু
আমার ছড়া শুনলে হবে
এক্কেবারে ফিদা
ফুল-পাখি, নদনদী নিয়ে
ছড়া লিখি আমি
আমার ছড়া সস্তা হলেও
গুণে-মানে দামি
আমার ছড়ায় আছে আরো
দেশের নানান কথা
এমন ছড়া মিলবে নাকো
খুঁজলে যথা তথা
তাই বলি কী জলদি এসো
ফুরিয়ে যাবার আগে
নইলে বাপু পাবে না কেউ
একটি ছড়াও ভাগে।

খোকার আকাশ

নূরুন নাহার নাজমা

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
যেন শিশুর পায়ের নূপুর
সবুজ পাতা ঝকঝক
আকাশটা যে ফকফক
হিমেল হিমেল ঠান্ডা
পাখির ডানা ঝাঁপটা।
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমক
খোকা ছুটে দেখে এক পলক
মা খোকাকে দেন ধমক
বাবা আসলে বলবেন সব।
খোলা জানালার ফাঁকে
খোকা দেখে আকাশটাকে
ছোটো ছোটো মেঘ দৌড়ে চলে
খোকা দেখে এক মনে
হঠাৎ ঝিম আসে তার
খোকা বাবু ঘুমে একাকার।

মধুমাসে

বাতেন বাহার

মধুমাসে মধুবন বায়ে খেলে দোল
নেচে উঠে এই দেশ, এ মাটির কোল।
রোদে রোদে আম পাকে, লিচু পেকে লাল
বৃষ্টিতে রসময় জাম ও কাঁঠাল।
রসে ভরে আনারস বাড়ে হইচই
মধু খেতে গাঁয়ে আসে শহরের সই।
মধু মাসে মধুময় শিশুদের মন
কিশোরের কোলাহলে নাচে বাগ বন।
বাগ বনে দোল খায় রসে ভরা ফল
রসে ভরা জামরুল জিভে আনে জল।
টক মিঠে ফল খেয়ে নাচে বুলবুল
এ সময় মার বুকে হাসে নজরুল।
নজরুল বুলবুল বিদ্রোহী মন
যার গানে দোল খায় ফুল পাখি বন।
শিশু যুবা কিশোরের বাড়ে কোলাহল
বীর বেশে বলে কবি চল্ চল্ চল্।
মধুমাখা দিনক্ষণ মধুময় হাসি
মধু মাসে মউবন বড়ো ভালোবাসি।

বাংলাদেশ

নুসরাত জারিন

তুমি আমার জন্মভূমি
আমার ভালোবাসা
তোমায় নিয়ে হৃদয়ে আমার
অফুরন্ত আশা।

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন শুরু
তোমায় নিয়ে শেষ
তুমি আমার সকল কিছুর
প্রিয় বাংলাদেশ।

৮ম শ্রেণি. ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

বাংলার ফল

মো. রহমত উল্লাহ্

রসে ভরা লাল লিচু আনারস জামরুল
তাজা তাজা ফল খেতে গ্রামে আসে কামরুল।

পাকা আম খেয়ে খুকি বলে- ভারি মিষ্টি
কাঁঠালের কোয়াগুলো কী দারুণ সৃষ্টি।

আনার বা ডালিমের দানাগুলো টস টস
আতা মেওয়া সফেদার কোয়াগুলো রস রস।

কচকচে গোলাপ জাম পেয়ারা ও পানিফল
টক মজা তৈকর, টিপা- চুকা- আঁশফল।

খরমুজ তরমুজ মনে হয় ভাই ভাই
খেজুরের কমলার যেন কোনো জুড়ি নাই।

কামরাঙা লটকন করমচা কেউয়া
জাম্বুরা জলপাই অরবরি ডেউয়া

হরিতকি সাতকরা বিলম্বি বেতফল
আমলকি আমড়া লেবু কুল গাব ফল।

ফুটি-বাঙি বেশি মজা চিনি দিলে সঙ্গে
কচি তাল চালতার একই রূপ অঙ্গে।

বারো মাস পাওয়া যায় কলা পেঁপে নারিকেল
খুব মজা শরবত গুড়ে দিলে পাকা বেল।

কদবেল, বহেড়া, ডুমুর, ডেউয়া ফল
চাম্বুল, তেঁতুল, এ ফল সে ফল

নুনে-ঝালে গুণে ভরা টক ফল ভর্তা
খেয়ে খুশি মেয়ে-ছেলে গৃহীনি ও কর্তা।

দাঁতরাঙা পাকা জামে মুখ হয় রাঙ্গা
বাংলার ফল খেয়ে দেহ-মন চাঙ্গা।

বুদ্ধির খেলা

আনোয়ারা বেগম

টিপু ঝড়ের দিনে মামার বাড়িতে আম কুড়াতে খুব পছন্দ করে। তাই ওদের নানু মামাকে বললেন, সামনে তিনদিন স্কুল বন্ধ আছে। এই তিনদিনের বন্ধে টিপু দিপুকে তুমি এখানে নিয়ে আসো। নানুর কথামতো মামা ওদেরকে মামার বাড়িতে নিয়ে আসলেন।

তোমরা কি কখনো ঝড়ে মামার বাড়িতে আম কুড়ানোর আনন্দ উপভোগ করেছো? হালকা পাতলা ঝড় কিন্তু খুব উপভোগ্য। যে ঝড় প্রাণহানি ঘটায় না, ঘরবাড়ি সম্পদ নষ্ট করে না। এমন ঝড় শেষে যখন আমগাছের নিচে আম পড়ে থাকে তখন আমগুলো কুড়াতে কী যে আনন্দ! তারপর মামার বাড়ি হলে তো আর কথাই নেই। তবে তোমাদের নিয়ে অনেক সমস্যা। একটু বৃষ্টিতে ভিজলে অথবা একটু বাতাস লাগলে তোমাদের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তাই এই কাজটি এমনভাবে করতে হবে যাতে তোমরা নিজেদের ঠান্ডা-সর্দি থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারো।

টিপু দিপু মামার বাড়িতে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু দিন পার হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের কোনো দেখা নেই। দুই ভাই চিন্তায় পড়ে। স্কুল মাত্র তিনদিন বন্ধ, যদি ঝড় না আসে, আম কুড়াতে না পারে তাহলে তো তাদের আসাটাই বৃথা। দিপু বলল, ভাইয়া, আসা বৃথা হবে কেন? আমরা গাছ থেকে আম পেড়ে নেব। রাতে দুই ভাই ঘুমিয়ে আছে। নানু ফজর নামাজ পড়ে নাতিদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর নানারকম চিন্তা করছে। দুই ভাই তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। নানু দরজা-জানালা খুলে দেখে আকাশ খুবই মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিকে অন্ধকার, ঝড় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। নানু চিন্তা করল, ওদেরকে আর ঘুমাতে দেওয়া যাবে না। এখনই জাগাতে হবে। নানু ওদেরকে আদর করে ডাকল। গত রাতে গল্প করে ওদের ঘুমাতে অনেক দেরি হয়েছে, তাই ওদের উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও ঝড়ের কথা শুনে ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষা করছিল

কখন ঝড় আসবে। সকাল ৭টার দিকে শুরু হলো ঝড়। দুই ভাই বারান্দায় কয়েকজন শিশু-কিশোরদের সাথে বসে ঝড় দেখছিল। দিপু মাঝেমধ্যে ঝড়ের মধ্যে যেয়ে আম কুড়াতে চাইছিল। কিন্তু নানু তাকে যেতে দেয়নি এবং অন্য ছেলে-মেয়েদেরও বলে দিয়েছে, আম কুড়াতে যেতে পারবে না। টিপু দিপু বেড়াতে এসেছে, ওরাই প্রথম আম কুড়াবে।

নানুর কথামতো ঝড় শেষে টিপু দিপু আম কুড়াতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর নানু সব ছেলে-মেয়েদের আম কুড়ানোর সুযোগ দিল। দিপু সবচেয়ে বেশি আম কুড়িয়েছে। আম কুড়াতে কুড়াতে মাথায় তার একটা বুদ্ধি চলে এসেছে। তাই দৌড়ে নানুর কাছে এসে বলল, নানু আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তুমি একটা বুদ্ধির খেলার আসরের আয়োজন করো। নানু বললেন, দুপুরে খাওয়ার পর আয়োজন করব। তবে শর্ত হলো এই আসরে আমিও থাকব। তবে তোমার দলে নয়, টিপুর দলে। দেখব তোমার বুদ্ধি বেশি না আমার বুদ্ধি বেশি। তুমি আসরে যাদের যাদের রাখবে তাদের বলে দাও, ৩টার দিকে যাতে চলে আসে। যেই বলা সেই কাজ। দিপু সবাইকে বলে দিল তিনটায় চলে আসতে।

দিপু বুদ্ধির আসরের জন্য একই আকৃতি ও ওজনের ৯টি আম নিল। সে নানুর কাছ থেকে একটি বাটখারাবিহীন দাঁড়িপাল্লাও জোগাড় করল। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে ৯টি একই ওজনের আম বের করল। তারপর নানুর কাছ থেকে একটি ছোটো ভারী লোহার পাত নিয়ে একটি আমে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যাতে কেউ বুঝতে না পারে। আমে পাত ঢুকানোর ফলে সেই জায়গায় একটা চিহ্ন দেখা দিয়েছে, যা দেখে সবাই বুঝে ফেলবে এই আমটা লোহার পাত ঢুকানো আম। কেউ যাতে চিহ্ন দেখে বুঝতে না পারে কোন আমে লোহা ঢোকানো হয়েছে। তাই সে সবগুলো আমে একই রকম চিহ্ন করে দিয়ে সবগুলোতে স্কচটেপ এঁটে দিয়েছে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

বিকাল তিনটায় সবাই বুদ্ধির খেলার আসরে উপস্থিত। দিপু টিপুকে বলল, ভাইয়া, যেহেতু আমরা আম কুড়িয়েছি, আম নিয়েই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে এবং আম নিয়েই আজকের বুদ্ধির খেলার আসর হবে। আজকে তোমরা সবাই নানুসহ একদল আর আমি একা। তাহলে শুরু করি :

এই যে ঝুড়িতে দেখতে পাচ্ছো ৯টি আম। এই আমগুলো কাঁচা, দেখতে একই আকৃতির এবং একই ওজনের। তবে আমি একটি আমের মধ্যে লোহার পাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। ফলে ৮টি আমের ওজন একই এবং শুধু লোহার পাত ঢুকানো আমের ওজন বেশি। এখানে আছে একটি বাটখারাবিহীন দাঁড়িপাল্লা। খেলাটি হলো এই দাঁড়িপাল্লা দিয়ে শুধু দু'বার ওজন দিয়ে লোহার পাতের আমটি বের করতে হবে। তোমরা কেউ যদি আমটি আলাদা করতে পারো তাহলে এই ৯টি আমসহ আমার সবগুলো আম তাকে দিয়ে দিব। সবাই চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু কেউই আমটি বের করতে পারল না। নানু তুমি তো খুব বলছিলে, পারলে না তো? নানু বলল, তাই নাকি? তাহলে দেখো আমি তোমাকে বের করে দেই। নানু কিন্তু ঠিকই কিছুক্ষণের মধ্যে দুর্বার ওজন করেই লোহার পাতের আমটি বের করে দিয়েছিল। নানু ৯টি আম একত্রিত করে দিয়ে দিপুকে বলল এবার তুমি তাদেরকে দেখিয়ে বলে দাও কোন বুদ্ধিতে আমি আমটি বের করেছি।

বুদ্ধি: আম ৯টি একই ওজনের ছিল। একটি আমে লোহার পাত প্রবেশ করানোর ফলে আমটি বাকি ৮টি আমের চেয়ে ভারী। দিপু প্রথম ৯টি আম নিয়ে সমান ৩ ভাগ করল। এবার বাটখারাবিহীন দাড়িপাল্লার দুই পাল্লায় দুই ভাগ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের) তিনটা তিনটা করে আম দিল। তৃতীয় ভাগ রইল পাল্লার বাইরে। এবার দিপু ওজন নিল।

প্রথম পর্যায়: যদি দুই পাল্লার ওজন সমান থাকে তাহলে বুঝতে হবে লোহার পাতযুক্ত আমটি পাল্লার মধ্যে নেই, তা আছে তৃতীয় ভাগে। তাই পাল্লার আমগুলো সব নামিয়ে তৃতীয় ভাগের আম থেকে দুই পাল্লায় দুটি আম দিল এবং একটি আম রইল বাইরে। এবার দিপু পাল্লার ওজন নিল। যদি দুই পাল্লার ওজন সমান হয় তাহলে বোঝা যাবে তৃতীয় আমটি লোহার পাতযুক্ত। আর যদি পাল্লা দু'টির ওজন সমান না হয় তাহলে ভারী পাল্লার আমটি লোহার পাতযুক্ত আম।

দ্বিতীয় পর্যায়: দুই পাল্লায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আম দিয়ে ওজন দেওয়ার পর পাল্লার ওজন যদি সমান না হয় তাহলে বোঝা যাবে লোহার পাতযুক্ত আমটি আছে ভারী পাল্লায়। এবার হালকা পাল্লার আমগুলো নামিয়ে

ভারী পাল্লার তিনটি আমের মধ্যে দুই পাল্লায় দু'টি আম এবং তৃতীয় আমটি বাইরে আলাদা করে রেখে এবার ওজন দাও। যদি ওজন সমান হয় তাহলে আলাদা করে রাখা তৃতীয় আমটিই লোহার পাতযুক্ত আম। আর যদি পাল্লা দু'টোর ওজন সমান না হয় তাহলে ভারী পাল্লার আমটিই লোহার পাতযুক্ত আম। দিপু বলল নানু এবার তুমি বলো আমার বুদ্ধি ঠিক আছে কিনা এবং আমার বুদ্ধি তোমার বুদ্ধির সাথে মিলেছে কিনা? নানু বলল, একবারে ঠিক বুদ্ধি বের করেছো। তোমার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির সাথে মিলে গেছে। আর মিলবেই না কেন? বের করার বুদ্ধি একটাই। তবে আমার বুদ্ধি তোমার বুদ্ধি সমান নয়। তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি। তুমি নবীন, আমার পর্যায়ে আসতে আসতে তুমি অনেক অনেক বেশি জানবে, অনেক কিছু আবিষ্কার করবে, তোমরা নিজেদের এভাবেই গড়ে তুলবে।

এমন সময় মামা এসে হাজির। মামাকে দেখে দিপু বলল, মামা, আমগুলো নিয়ে আমার মাথায় কতগুলো প্রশ্ন এসেছে। তুমি কী এর উত্তর দিবে। মামা বললেন, আমার জানা থাকলে অবশ্যই দিব, বলো তোমার প্রশ্নগুলো।

দিপু মামাকে একটি কাঁচা আম ও একটি পাকা আম দেখিয়ে বলল, মামা দেখো আম দুটোর মধ্যে কাঁচা আমটি কী সুন্দর সবুজ, শক্ত ও খেতে টক। আর পাকা আমটি রঙিন, নরম ও খেতে মিষ্টি। আমার প্রশ্ন হলো:

প্রশ্ন: কীভাবে কাঁচা টক ফলটি পাকলে এমন রসালো ও মিষ্টি হয়ে যায়?

উত্তর: মামা বললেন, তুমি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো। আমাদের সবার মনেই কোনো না কোনো এক সময় এই প্রশ্নটা জেগেছে। কেউ হয়ত উত্তর পেয়েছি, কেউ হয়ত পাইনি। তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনো কেন এমনটি হয়। প্রাকৃতিকভাবে কাঁচা ফল পাকানোর জন্য মূল ভূমিকা পালন করে ইথাইলিন নামক একটি জৈব যৌগ। যার রাসায়নিক সংকেত হলো $CH_2=CH_2$। এই যৌগটি গাছ অথবা ফলে প্রাকৃতিকভাবেই উৎপাদন হয়। ফল যখন বড়ো হতে থাকে তখন ফলে এই যৌগটি উৎপাদিত হতে থাকে। ফল যখন পরিপক্ক হয় তখন এর উৎপাদনের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি। ফলে থাকে বিভিন্ন ধরনের জিন। ফল যখন পরিপক্ক হয় তখন ফলে উৎপাদিত ইথাইলিন ফলের মধ্যে জিনকে উদ্দীপিত করে। এর ফলে তৈরি হয় নানা ধরনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক এনজাইম। ফলের গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম এমাইলেজ ফলের মধ্যে অবস্থিত স্টার্চকে ভেঙে সুক্রোজ ও ফ্রুকটোজে রূপান্তরিত করে। তোমরা অনেকেই জানো সুক্রোজ ফ্রুকটোজ চিনি জাতীয় পদার্থ। সুক্রোজ ও ফ্রুকটোজ ফলের পানির সাথে মিশে ফলকে করে তোলে রাসালো ও মিষ্টি। তাই পাকলে ফল হয়ে যায় রসালো ও মিষ্টি।

প্রশ্ন : কাঁচা সবুজ আমটিই বা কীভাবে রঙিন হয়ে যায়?

উত্তর: মামা বললেন, ইথাইলিন যৌগটি ফলের মধ্যে অবস্থিত জিনকে উদ্দীপিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এনজাইম তৈরি করে। এর মধ্যে এক ধরনের এনজাইম আছে যা ফলের সবুজ ক্লোরোফিলকে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রঙিন উপাদানের, যেমন: কেরোটিনয়েডের সৃষ্টি করে। এতে সবুজ কাঁচা ফল লাল বা হলুদ হয়ে যায়।

বাঘ ও সিংহ

মাহদি তানিম রেদওয়ান

এক বনে বাস করত এক বাঘ আর এক সিংহ।

বাঘ ছিল বনের রাজা আর সিংহ ছিল মন্ত্রী। বাঘ রাজার কোনো রানি ছিল না। তাই বাঘের খুব মন খারাপ। একদিন সে বাইরে ঘুরতে গেল।

সিংহ ছিল খুব লোভী। বাঘ ঘুরতে যাওয়ার পর সে সবাইকে বলল, বাঘ ঘুরতে যাওয়ার সময় আমাকে বনের রাজা বানিয়ে গেছেন। আজ থেকে আমি তোমাদের রাজা।

অনেকদিন পর রাজা বনে ফিরে এল। এসে দেখল সিংহ তার সিংহাসনে বসে আছে। বাঘ বলল, সিংহ আমার সিংহাসনে বসে আছে কেন?

হরিণ বলল, তিনি তো আমাদের রাজা।

বাঘ বলল, কে বলল এ কথা?

হরিণ বলল, কেন ? আপনিই তো ভ্রমণে যাওয়ার সময় সিংহকে রাজা বানিয়ে গেছেন।

বাঘ রেগে বলল, এ কথা কে বলেছে?

হরিণ বলল, সিংহ বলেছে।

বাঘ রাগে গর্জে উঠল। হুংকার দিয়ে বলল, সিংহ বলেছে এ কথা?

হরিণ বলল, জি।

ঠিক আছে, আমি তাকে দেখাচ্ছি মজা । বলে রাজা রাগে কাঁপতে লাগল। সেনাপতিকে ডেকে বলল, এক্ষুণি সিংহকে বন্দি করো ।

রাজার কথা শুনে সেনাপতি হাতি সাথে সাথে সিংহকে গ্রেফতার করল এবং জেলে আটকে রাখল।

দেখলে তো বন্ধুরা, লোভের জন্য সিংহের কী পরিণতি হলো! তাই কখনো লোভ করতে নেই। লোভ করা ভালো নয়।

প্রথম শ্রেণি, হলিলাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর

দৃষ্টি জয়ীরাও পড়তে ভালোবাসে

নাজিয়া জাবীন

যারা স্পর্শ করে বই পড়ে। আমরা তাদের বলি দৃষ্টি জয়ী মানুষ। তারা স্পর্শ করে যে বইটা পড়ে সে বইকে বলা হয় ব্রেইল বই। ব্রেইল বই আবিষ্কার করেন ফরাসি বিজ্ঞানী লুই ব্রেইল। বহু যুগ আগে।

বাংলাদেশে এর প্রচলন থাকলেও ২০০৯ এর পূর্বে কেউ অনুধাবন করেনি আর সবার মতন দৃষ্টি জয়ী ব্যক্তিরাও বই পড়তে ভালোবাসে। লেখাপড়ার বই ছাড়াও তারা সাহিত্যচর্চা করতে ভালোবাসে। তারা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছড়া, ছোটো গল্প সব বই পড়তে চায়।

২০০৯ সালে স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা নাজিয়া জীবীনের *ছড়ার তালে মনটা দোলে* ছড়ার বইটি প্রথমে ব্রেইলে প্রকাশ করে। তারপর থেকে আর ফিরে দেখা নয়। স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা এক এক করে ৬১টি বই এ পর্যন্ত ব্রেইলে প্রকাশ করেছে। স্পর্শ যেমন বই মেলাতে মুক্ত করেছে দৃষ্টি জয়ী ব্যক্তিদের। তেমনি ১লা জানুয়ারি আর সকল ছাত্রছাত্রীদের মতো তারাও যেন হাতে বই পায় সে বিষয়েও নিয়েছে উদ্যোগ।

এখন দিনরাত ব্রেইল প্রিন্টারে কাজ হয়। এতে করে দৃষ্টি জয়ী মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে।

এ বছরের বইমেলা ছিল স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনার জন্যে অন্য রকম আনন্দের। কারণ স্পর্শ এ বছর দশ

বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি ব্রেইল প্রকাশনা। শুধু প্রকাশনা বললে ভুল হবে স্পর্শ একটি আস্থার জায়গা। এ বছর স্পর্শের দশ বছর। তাই আয়োজনটাও ছিল অন্য রকম। মুক্তিযুদ্ধের গল্প, স্বাস্থ্যতথ্য, উপন্যাস, মন বিজ্ঞানের গল্প, ছড়ার বই, ছোটো গল্প, জীবনী, রান্নার রেসিপি বই দিয়ে জমজমাট ছিল স্পর্শের স্টল।

বাংলা একাডেমির সহায়তার এবারো আমরা দুটি স্টল পাই। আর স্টলটির সজ্জায় এগিয়ে আসেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। যারা যারা ব্রেইল বই দিয়ে স্টলটি সাজিয়ে তুলেছিলেন এদের সবার কাছেই স্পর্শ ঋণী। এ বছর আনিসুল হকের অসাধারণ উপন্যাস *মা* বইটির ব্রেইল প্রকাশ হয়। ৪টি খণ্ডে ব্রেইল বইটি প্রকাশ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ কতটা কষ্টের কতটা ত্যাগের এই উপন্যাস থেকে তা অনুভব করা যায়। পরবর্তী প্রজন্ম এই বইগুলো না পড়লে আমাদের সকলের হৃদয়ে মুক্তি যুদ্ধের কঠিন সময়টা চির জাগরুক থাকবে মো: জাফর ইকবালের *আঁখি এবং আমরা কজনা* এবং *আমি তপু* বই দুটিও ব্রেইলে প্রকাশ পায়। স্পর্শের দশ তম জন্মদিনে লেখক নিজ খরচে বই দুটি আমাদের উপহার দেন। মালেকা বেগমের সুফিয়া কামাল বইটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীরা খুব আগ্রহ ভরে নিয়েছে। তারা জানতে চায় আমাদের অগ্রজ নারীদের জীবন। তারা তাদের ধারণ করতে চায় অন্তরে।

ছোটো সোনামনিদের জন্য এ বছর বেশ কটি বই ছিল ব্রেইলে। যেমন নাজিয়া জানীনের *হাঁসের পায়ে ঘুড়ি*, লুৎফর রহমান রিটনের *ঝ্যং আর প্যাং*। এটি একটি দারুণ মজার ছড়ার বই। এ বছর ছিল দুটি মজার মজার রান্নার রেসিপি বই। ছিল মন বিজ্ঞানের বই *স্বপ্ন ডানা*। ছোটোদের জন্য আরো ছিল *সুন্দর বনের সাদা পাহাড়*। এক কথায় জমজমাট ছিল স্পর্শ। প্রতিদিন কত গুণিজন এসেছেন স্পর্শের স্টলে। তাঁদের উৎসাহ বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। *স্পর্শ* স্বপ্ন দেখে একটা ব্রেইল লাইব্রেরির। আগামীতে বন্ধু স্বজন সকলের সহায়তা পেলে আমরা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাব। গড়ে তুলব সুন্দর সমাজ, যেখানে সকলে বই পড়বে, সকলে জানবে পৃথিবী কে। আলোকিত হবে সবার মন, আলোকিত হবে সবার জীবন। স্পর্শ সকলের সাথে ছিল। স্পর্শ আছে। স্পর্শ থাকবে সকল বই প্রেমিদের মাঝে চির কাল। যারা স্পর্শ করে বই পড়ো তাদের জন্যে রইল বিশেষ ভালবাসা আর আগামী বছরে সবার জন্যে রইল বইমেলার *স্পর্শের* স্টলে অগ্রীম নিমন্তন্ন।

টি-টোয়েন্টিতে নারীদের এশিয়া জয়

জান্নাতে রোজী

দেশের ছোটো-বড়ো প্রতিটি মানুষ যখন পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত, কোন পোশাকে কাকে কেমন লাগবে, কীভাবে সাজাবে নিজেকে, কী কী রান্না হবে সেদিন ঘরে- এসব নানা বিষয় নিয়ে মানুষের যখন দম ফেলানোর সময় নেই, ঠিক তখনই সেই আনন্দকে আরো দ্বিগুণ করে দিতে বাতাসে ভেসে এল একটি খবর। খবরটি এসেছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে। আর সেটি এক নিমিষে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠেছে পুরো দেশ। এ এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। নবারুণের পাঠক বন্ধুরা, এবারতো নিশ্চয়ই সবাই বুঝে গেছ খবরট কী? হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে আমিও বলি খবরটি হচ্ছে, নারীদের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে এটিই বাংলাদেশের ঘরে তোলা প্রথম শিরোপা। এ প্রথম শিরোপা এল মেয়েদের হাত ধরে- ভাবতে কেমন ভালো লাগছে, তাই না বল? এবার চল দেখি কীভাবে সম্ভব হলো এই কৃতিত্ব অর্জন।

এর আগে এশিয়া কাপের এ সপ্তম আসরে প্রথম ম্যাচটি শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যাওয়ার পর পরের টানা চার ম্যাচেই জয় পায় বাংলাদেশ। পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যান্ড এবং সবশেষে মালয়েশিয়াকে বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। অপরদিকে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকেট পায় ভারত।

এবার নিয়ে সপ্তমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপ। প্রথম চারবার (২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮) ওয়ানডে ফরমেটে হয়েছে এ টুর্নামেন্ট। পরের তিনবার (২০১২, ২০১৬, ২০১৮ সাল) হয়েছে টি-২০ ফরমেটে। এবারই ফাইনাল খেলেছে বাংলাদেশ এবং প্রথম ফাইনালেই বাজিমাত। মেয়েদের হাত ধরে প্রথ মবারের মতো ক্রিকেট অঙ্গনের কোনো আন্তর্জাতিক শিরোপা এল বাংলাদেশের ঘরে। নবারুণের বন্ধুরা, এখন তো আমরা আশা করতেই পারি— তোমাদের হাত ধরেই আমাদের ঘরে আসবে ক্রিকেট, ফুটবলসহ অন্যান্য খেলার সব শিরোপা।

ফল প্রদর্শনী

মো. জামাল উদ্দিন

আম, জাম, কাঁঠালের ম-ম গন্ধ। চারদিকে শুধুই মুখরোচক নানা ফলের সমাহার। কেউ কিনছেন কেউবা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। গত ২২, ২৩ ও ২৪শে জুন এ দৃশ্য ছিল রাজধানীর খামারবাড়ির জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে।

২৪শে জুন মেলার শেষ দিন হওয়ায় ভিড়ও ছিল অন্য দুইদিনের চেয়ে একটু বেশি। এদিন ফল না কিনে খালি হাতে কেউ ফেরেনি। তিনদিন ধরে চলা এই ফল প্রদর্শনীতে লাখো মানুষের পদচারণায় বিক্রি হয়েছে ৫০ লাখ টাকারও বেশি ফল।

কৃষি মন্ত্রণালয় 'অপ্রতিরোধ্য দেশের অগ্রযাত্রা, ফলে পুষ্টি দেবে নতুন মাত্রা' প্রতিপাদ্যে শুরু হওয়া জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সমাপনী টানা হয় ২৪শে জুন। সমাপনী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কারও। মেলায় প্রবেশ করতেই একটি মিষ্টি সুঘ্রাণ আসে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, আনারসসহ প্রায় শতাধিক নানা ধরনের ফলের ঘ্রাণে একটি আলাদা ঘ্রাণ সৃষ্টি হয় মেলার ভেতরে। মেলার ভেতরেই নানা ফল দিয়ে তৈরি করা হয় ফলের স্তম্ভ।

আয়োজকদের মতে, তিনদিনে লক্ষাধিক দর্শনার্থী আসে এ মেলায়। যেখানে আম ও অন্যান্য ফলসহ ৮০ টন ফল বিক্রি হয় যার মূল্য ৫০ টাকারও বেশি।

এবারের প্রর্দশনীতে ৯টি সরকারি ও ৫১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৮১টি স্টল ছিল। আমের ১০২ জাতসহ ৯৯ প্রজাতির ফল প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে ছিল প্রচলিত ৫৪, অপ্রচলিত ৩৬ ও বিদেশি ফলের ৯ জাত। প্রদর্শনীতে জাতীয় ফল কাঁঠালের একটি বিশেষ কর্নারে কাঁঠালের তৈরি ১২৩ রকমের মুখরোচক খাবার প্রদর্শন করা হয়। পায়েস থেকে শুরু করে নানা ধরনের পিঠাতেও ব্যবহার করা হয় কাঁঠাল। কাঁঠাল কর্নারে সেই চিত্রই তুলে ধরা হয়। দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হয়ে কাঁঠালের নানা ধরনের তৈরি খাদ্যপণ্যের বিয়ষটি উপভোগ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টল, ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রগতিশীল কৃষক, প্রতিষ্ঠান পর্যায় ও সর্বোচ্চ ফলদ বৃক্ষ রোপণকারী জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১৫ ছাত্রছাত্রীর মাঝে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

প্রিয় ফল কলা

শচীন্দ্র নাথ গাইন

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় খুব চেনা ফল কলা,
গুণগুলো তার শেষ হবে না হোক না যতই বলা।
কাঁচকলাতে তরকারি হয় তা খাওয়া যায় রেধে,
পাকলে তাকে চায় না নিতে দিক না যতই সেধে।

শবরী, চাপা, সাগর কলা কেউ মাখে দুধভাতে,
এমনিও কেউ খায় সেগুলো পাকলে নিয়ে হাতে ।
অনেক রোগীর পথ্য তা যে হজমও হয় বেশি,
জাতও কলার হরেক রকম বিদেশি ও দেশি।

হতাশা ও বিষন্নতা যেতেও পারে দূরে ,
রক্তের চাপ কমাতে তার নামটা আসে ঘুরে।
সারা বছর যারা কেবল ভুগতে থাকে বাতে,
নিয়মিত কলা খেলে ফল তারা পায় সাথে।

ক্লান্তি কমায় এই কলাতে বাড়ায় দেহের বল,
পুষ্টিমানে তুলনাহীন সকল ঋতুর ফল ।
ভিটামিনের উৎস কলায় আমিষ,খনিজ থাকে,
খাদ্য তালিকায় অনেকেই নিত্য এটা রাখে।

রোজায় কলা পূজায় কলা কলা সকল কাজে,
তাই তো এটার কদর ভারি সব সমাজের মাঝে।
অনেক ফলের চাইতে যে তার মূল্যটা কম অতি,
নিয়মিত কলা খেলে লাভ ছাড়া নেই ক্ষতি ।

তথ্য অধিকার আইন

মেজবাউল হক

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি জানো আমাদের দেশে রয়েছে তথ্য জানার জন্য তথ্য অধিকার আইন? বড়োদের পাশাপাশি জানতে হবে তোমাদেরকেও। তাইতো এসো জেনে নেই তথ্য অধিকার নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা।

তথ্য অধিকার আইন সাধারণত জনগণের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা বিষয়ক আইন নামে পরিচিত। একে বলে উন্মুক্ত তথ্য। কিছু কিছু দেশে এ আইনের শিরোনাম হলো তথ্য স্বাধীনতা আইন। তথ্যসূত্রে জানা যায়, এ ধরনের আইন পৃথিবীর ৭০টি দেশে প্রচলিত। ১৭৬৬ সালে প্রথম সুইডেনে এ ধরনের আইন প্রবর্তিত হয়।

সার্কভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্রই তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছে। ভারতে এ ধরনের আইন ২০০৫ সালে গৃহীত হয়, যা তথ্য অধিকার আইন নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রজ্ঞাপন গেজেটের মাধ্যমে জারী করে (অধ্যাদেশ নং ৫০, ২০০৮)। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কিছু সংশোধনীসহ এ সংক্রান্ত বিল ২০০৯ সালের ৩০ মার্চ অনুমোদন করে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি বা বিদেশি অর্থ সাহায্য পুষ্ট বেসরকারি সংস্থাসহ সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য অধিকার আইন মূলত একটি আইনি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি তথ্য জনগণকে প্রদান করতে হয়। কোনো নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়, অন্য কারো উপর নয়। যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করে তাহলে এর জন্য উপযুক্ত কারণ জানাতে হয়।

এ আইনের বিধানে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার (সিআইসি) এবং অন্য দু'জন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মরতুজা আহমদ।

অজানাকে জানো

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো। তোমরা তো জানোই মানুষের জানার আগ্রহ অসীম। আর আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে নানান ঘটনা। কিন্তু কতগুলো ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি? পৃথিবীতে এমন ঘটনা বা তথ্য আছে যা শুনে আমরা মাঝে মাঝে অবাক হই, আশ্চর্য হই কিংবা অনেক সময় হাসিতে ফেটে পড়ি। আসো আমরা এমন অজানা কিছু মজার তথ্য জেনে নেই।

- তোমার দু-চোখ প্রতিদিন যে পরিমাণ পরিশ্রম করে সেই পরিমাণ পরিশ্রম যদি তুমি তোমার পা দুটোকে করাতে চাও তাহলে তোমার প্রতিদিন কতটুকু হাঁটতে হবে জানো? মাত্র ৮০ কিলোমিটার
- সমুদ্রের তলদেশে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে-তা যদি উত্তোলন করা সম্ভব হতো তবে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ ২০ কেজি করে স্বর্ণ পেতো!
- সারা বিশ্বে কোকাকোলা-র প্রস্তুত প্রণালী মাত্র দুজন জানে এবং তাদের একই বিমানে যাতায়াত নিষিদ্ধ
- অংকে এক মিলিয়ন লিখতে ৭টি সংখ্যা লাগে। তেমনি ইংরেজিতে মিলিয়ন শব্দটি লিখতেও ৭টি অক্ষর লাগে
- হাঙরের কোনো রোগ হয় না
- ডিমের কুসুম যাতে খোসায় লেগে যেতে না পারে, তাই মুরগি তার ডিমকে দিনে প্রায় ৫০ বার উলটে দেয়
- এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র হলো ফিলিপাইন
- তোমার হাঁচির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল
- উটের দুধ দিয়ে দই হয় না
- পায়ের নখের চেয়ে হাতের নখ প্রায় ৪ গুণ দ্রুত বড়ো হয়
- নেপাল একমাত্র দেশ যে দেশের পতাকা চতুর্ভুজ নয়
- পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশই হলো মরুভূমি।
- পৃথিবীর সব সাগরে যে পরিমাণ লবণ আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে ৫০০ ফুট পুরু লবণের স্তুপ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে
- ঘোড়ার লেজ কাটা পড়লে তা মারা যায়
- 'রিভার ডি' পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নদী
- আমেরিকার ওকল্যান্ড ব্রীজ পৃথিবীর বৃহত্তম ব্রীজ।
- কলা এবং সবুজ আপেল ওজন কমাতে সাহায্য করে
- তুমি কী জানো, পশুদের মধ্যে জিরাফের জিহ্বা সবচেয়ে কালো
- অস্ট্রেলিয়াতে এক ধরনের কেঁচো পাওয়া যায় যা লম্বায় ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

সোনালি দাস, দ্বিতীয় শ্রেণি, সোয়াখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

মুযাক্কির আহমেদ কাদির, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্কলার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

তানিসা ইসলাম মিমু, লিটল এঞ্জেলস স্কুল, কেজি, চামেলিবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা

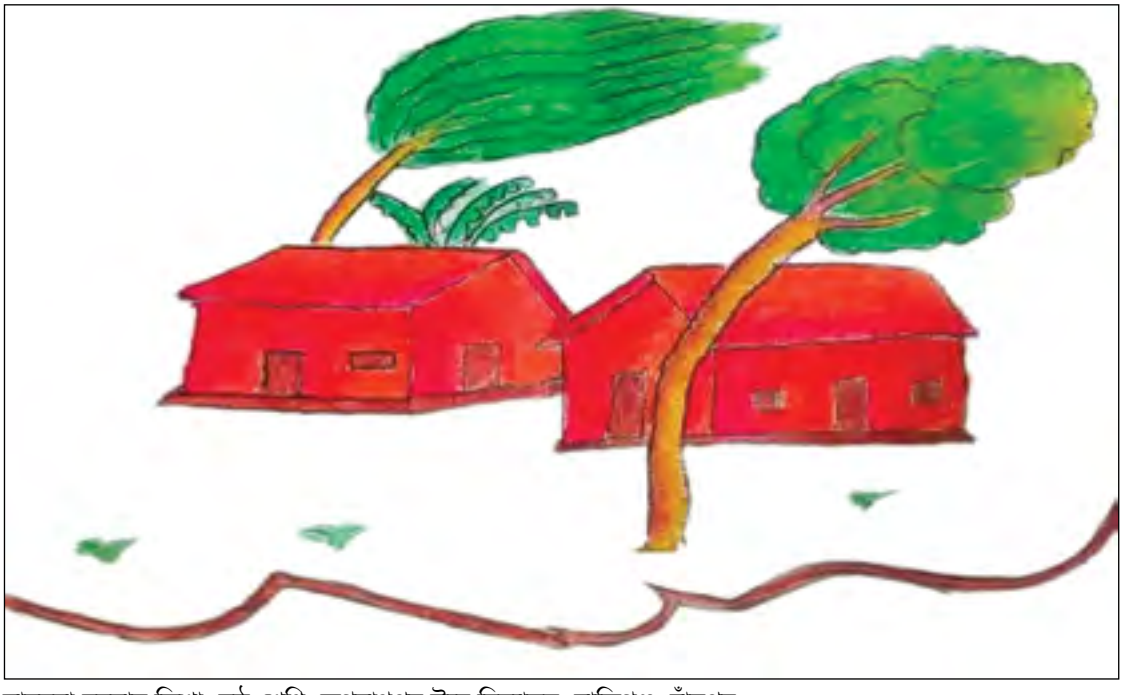

মাহবুবা রহমান তিশা, ষষ্ঠ শ্রেণি, জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর